একক ৭ ❒ রবীন্দ্রনাথ

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা
৭.১ সারাংশ ও আলোচনা
    ৭.১.১ মেঘদূত
    ৭.১.২ অনুশীলনী
৭.২ বসুন্ধরা
    ৭.২.১ অনুশীলনী
৭.৩ জীবনদেবতা
    ৭.৩.১ অনুশীলনী
৭.৪ স্বপ্ন
    ৭.৪.১ অনুশীলনী
৭.৫ উদাসীন
    ৭.৫.১ অনুশীলনী
৭.৬ আগমন
    ৭.৬.১ অনুশীলনী
৭.৭ অপমানিত
    ৭.৭.১ অনুশীলনী
৭.৮ দূর হতে কী শুনিস
    ৭.৮.১ অনুশীলনী
৭.৯ মুক্তি
    ৭.৯.১ অনুশীলনী
৭.১০ তপোভঙ্গ
    ৭.১০.১ অনুশীলনী
৭.১১ সবলা
    ৭.১১.১ অনুশীলনী
৭.১২ সাধারণ মেয়ে
    ৭.১২.১ অনুশীলনী
৭.১৩ বাঁশিওয়ালা
    ৭.১৩.১ অনুশীলনী
৭.১৪ দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
    ৭.১৪.১ অনুশীলনী
৭.১৫ তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
    ৭.১৫.১ অনুশীলনী
৭.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন ধরে সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'কবিকাহিনী' লেখা হয় ১৮৭৮ সালে এবং শেষ কাব্য 'জন্মদিনে' লেখা হয় মৃত্যুর পূর্বে ১৯৪১ সালে। অর্থাৎ ষাট বছরেরও বেশি সময়ে তিনি অজস্র কাব্য কবিতা এবং গান রচনা করেছেন। সেই সব কাব্য-কবিতা এবং গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাব গভীরতা পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্ময়বিমূঢ় করে। সীমা এবং অসীমের মিলন সাধনে কবি-চিত্ত নিত্য আন্দোলিত হয়েছে। মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে আনন্দময় পরমসত্তার লীলা তাকে তিনি অনুভব করতে চেয়েছেন। বিশ্বের যাবতীয় খণ্ড সৌন্দর্যের পিছনে তিনি অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তার অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন। রূপ এবং অরূপকে তাই তিনি ঐক্যসূত্রে বন্ধ করতে চেয়েছেন। এই অরূপের অনুভূতি থেকেই তাঁর কাব্যে জন্ম নিয়েছে বিশ্ববোধ, প্রকৃতি ও মানবের মধ্যেকার গূঢ় রহস্য-চেতনা, মানব মহিমার জয়গান, অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্য ধ্যান, প্রকৃতির প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ ও গভীর মমত্ববোধ রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির রূপ-রস-গান তিনি যেমন উপভোগ করেছেন, তেমনি তাঁর অলৌকিকত্ব, অনন্তত্ব ও অসীমত্বও উপভোগ করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। প্রকৃতির মধ্যে তিনি প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন। তাই সমুদ্র তাঁর কাছে আদিজননী বসুন্ধরা, পদ্মা তাঁর প্রেয়সী, সূর্য তাঁর কাছে অনুভূত হয়েছে সর্বপ্রামের উৎসরূপে। বিশ্ব নিখিলের প্রাণের সঙ্গে আপনার যোগকে তিনি উপলব্ধি করেছেন গভীরভাবে। মর্ত্য-পৃথিবীর প্রতি তাঁর নিবিড় ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে কাব্যচর্চা করেছিলেন। পঁয়তাল্লিশ খানারও বেশি কাব্য তিনি রচনা করেছেন। 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সঙ্গীত'—এগুলি মূলত অপরিণত পর্বের রচনা। তবে এগুলির মধ্যে 'ভানুসিংহের পদাবলী' বিস্ময় জাগায়। এগুলি মূলত ১৮৭৮ সাল থেকে প্রকাশিত এবং ১৮৮২ সালের পূর্বে রচিত কাব্য। এগুলিকে তিনি পরিণত কাব্য সংকলনে স্থান দিতে চাননি। সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২) থেকে কবির কবিতা পরিণতি পেতে থাকল। এরপর লেখা হল 'প্রভাত্ সঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল'। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' বিষণ্ণতার কাব্য, 'প্রভাত সঙ্গীতে' কবির দৃষ্টি বহির্জগতে প্রসারিত হল, 'ছবি ও গানে' বস্তুজগতের অজস্ব ছবি শব্দ সহযোগে আঁকা হয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে' কবির ভাবানুভূতি ও রূপসাধনা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার নবপর্বের সূচনা হয়েছে 'মানসী' (১৮৯০) থেকে। এই পর্বেই কবির সঙ্গে শিল্পী এসে যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন কবি। ১৮৯৪-এ প্রকাশিত হয় 'সোনারতরী'। 'মানসী' কবির যৌবনকালের কাব্য। এই কাব্যে কবির প্রেম-চেতনা প্রকাশিত। তবে ইন্দ্রিয়ানুগ প্রেমচেতনাকে কবি ক্রমে ইন্দ্রিয়াতীত ভাবসর্বস্বতায় পরিণতি দিয়েছেন। 'সোনারতরী' ও 'চিত্রায়' (১৮৯৬) কবির সৌন্দর্য ও প্রেমচেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'মানসী' থেকে কবির প্রকৃতি চেতনার বিশিষ্টতা দানা বাঁধতে থাকে। কোনো কোনো কবিতায় চিরন্তন সৌন্দর্যের জন্য রোমান্টিক কবির বিরহার্তি ফুটে উঠেছে। 'সোনারতরী'তে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রার কামনা যেমন বাণীরূপ পেয়েছে, তেমনি মর্তমমতার প্রতি গভীর আকুলতা আত্মপ্রকাশ করেছে। সৌন্দর্য ও প্রেমের যে নিবিড় অনুভূতি আমরা 'চিত্রা'য় পেয়েছি 'চৈতালী' (১৩০৩)-তে তারই পরিণতি দেখতে পাই। 'কল্পনা' (১৯০০) রোমান্টিক কবির স্বপ্নলোকের কাব্য। এই কাব্যে কবি কল্পনাকে দূত করে কালিদাসের উজ্জয়িনীতে, এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের যে-কোনো স্থানে মানস ভ্রমণ করেছেন। 'ক্ষণিকা' (১৯০০)-য় লঘু চটুল সুরে কবি জীবনের এক গভীর সত্যকে তুলে ধরেছেন। 'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যে কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রাথমিক ধারা ব্যক্ত হয়েছে। 'স্মরণ' এবং 'শিশু' ব্যক্তিজীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

১৯১০ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়। এই পটে লেখা হয় 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'। 'খেয়া'তে পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে কবি অরূপানুভূতির আহ্বানে যাত্রা করেছেন।

'গীতাঞ্জলি'তে অরূপকে লীলাময় রূপে কবি কাছে পেয়েছেন। কাব্যের আঙ্গিক হিসেবে কবি গানকেই আশ্রয় করেছেন। ভক্ত-ভগবানের প্রকৃত মাধুর্যময় লীলার অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে গীতিমাল্যে। 'গীতিমাল্য'তে কবি যেন পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন, বিশ্ব-লীলার মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

'বলাকা' (১৯১৬) থেকে 'বনবাণী' (১৯৩১) পর্যন্ত কবির কাব্যের পরবর্তী যুগ। 'বলাকা' রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 'বলাকা' কবির গতিরাগের কাব্য। এর শিল্পরূপেও আছে নতুনত্ব। 'পূরবী' (১৯২৫) তে পৌঢ় কবি যৌবন স্মৃতি রোমমন্থন করতে চেয়েছেন। 'পূরবীর' জগৎ ও জীবন-প্রীতি 'মহুয়া'তে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'মহুয়া'তে কবির প্রেমচেতনার প্রসাধনকলা ও সাধনবেগের প্রকাশ ঘটেছে। 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বের শুরু। 'পুনশ্চের' প্রকাশ ১৯৩২। 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রতা', 'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যে নতুন ছন্দ ও বাক্‌বিন্যাসরীতির বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেজুঁতি', 'আকাশ প্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই' (১৯৪০) কাব্যে কবির মৃত্যুভবনা, উপনিষদিক বোধ, অতীত জীবনের মূল্যায়ন, মর্তমমতা প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে। 'রোগশয্যায়' (১৯৪০) এবং 'আরোগ্য' (১৯৪১)-তে কবির রোগ-ভোগ জনিত বিক্ষোভ, মৃত্যুর সত্যরূপ, মানবত্বের অমরাত্মার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ভাষা পেয়েছে। 'জন্মদিনে' কাব্যে পৃথিবীর প্রতি আসন্ন বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর শেষ কাব্য গ্রন্থ 'শেষলেখা' মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

৭.১ সারাংশ ও আলোচনা

৭.১.১ মেঘদূত

কালিদাসের অমর কাব্য 'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাবের শ্রেষ্ঠ নির্দশন তাঁর অনবদ্য কবিতা 'মানসী'র 'মেঘদূত'। আষাঢ়ের প্রথম দিনের মেঘ দেখে কালিদাস তাঁর মেঘদূত রচনা করেন। ফলে প্রথম আষাঢ়ের বর্ষার সঙ্গে মেঘদূত চিরকালের মতো বিজড়িত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন—'.....মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হয়ে দেখা দেয়। কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন, আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি..... । মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ('নববর্ষা'/বিচিত্র প্রবন্ধ)। কালিদাসের 'মেঘদূত' এক বিরহী যক্ষের হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত বেদনার রাগিণী। কালিদাসের যক্ষের বিরহ ব্যক্তিগত, রবীন্দ্রনাথ যক্ষের সেই ব্যক্তিগত বিরহের মধ্যে বিশ্বের সকল বিরহীর বাণীকে পুঞ্জীভূত হতে দেখেছিলেন। এ দেখা আধুনিক কবির দেখা। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় কালিদাসের 'মেঘদূত' পরিণত হয়েছে নবমেঘদূতে।

কালিদাসের 'মেঘদূত' মূলত সম্ভোগের কাব্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবি-মানস মেঘদূতের কাঠামোর মধ্যে বারে বারে নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছে ; এক অভিনব ভাবলোক সৃষ্টি করেছে। যক্ষ ও যক্ষবধূর বিরহকে রবীন্দনাথ মানুষের চিরন্তন বিরহের প্রতীকরূপে দেখিয়েছেন। অলকা তাঁর কাছে কামনার মোক্ষধাম, আদর্শ সৌন্দর্যের পাদপীঠ। যক্ষ ও যক্ষবধূর বিরহের উপর তিনি নতুন আলোক সম্পাত করেছেন—আপন কল্পনা ও অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে নিয়েছেন। কালিদাস বর্ণিত সৌন্দর্যময় অলকায় রক্তমাংসের বাস্তব যক্ষপ-ী বাস করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট সেই বিরহিনী তাঁর অশরীরিনী মানস-প্রিয়া, অনন্ত সৌন্দর্য ও নিত্য প্রেমের রাজ্য অলকায় একাকী কবির উদ্দেশ্যে নিত্যকাল একাকিনী জেগে আছে। কবির ভাগ্যে এ অভিশাপ আর ঘুচবে না, মিলন আর কোনোমতেই যেন সম্ভব নয়, কেবল চিরন্তন বিরহ-বেদনা, অপ্রাপ্তির বিষণ্ণতায় বিভোর হয়ে থাকা :

'ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান,

কে-দিয়েছে হেনশাপ, কেন ব্যবধান !
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ !
কেন প্রেম নাহি পায় আপনার পথ !'

কালিদাসের কার আর একাল অর্থাৎ সেকাল থেকে একালের এই ব্যবধানই রোমান্টিক কবিকে বিরহাতুর করে তুলেছে। কবি আজ শত চেষ্টা করলেও কালিদাসের কালের সেই উজ্জয়িনী অথবা অলকা, যেখানে নিত্য-জ্যোৎস্না বিরাজিত ছিল, যেখানকার জনপদবধূদের চোখের চাহনিতে পথিকের দিকভ্রম হত, যেখানকার নারীরা ধূপের ধোঁয়ায় তাদের কেশরাশির পরিচর্চা করত, সেখানে কবি সশরীরে পৌঁছোতে পারবেন না। সেই অগম্য স্থানে, ভ্রমণ না করতে পারা, সেখানকার সেই সৌন্দর্য আস্বাদ করতে না পারার কষ্টই কবিকে বিচলিত করেছে। তাই কবি কল্পনাকে দূত করে পৌঁছে যেতে চেয়েছেন তাঁর বিরহিনী মানস-প্রিয়ার কাছে। একালের কবি মেঘদূতের মধ্যে বিশ্বের সকল বিরহীর বেদনাকে অনুভব করেছেন। অনুভব করেছেন সেদিনের উজ্জয়িনী প্রাসাদ শিখরের ঘনঘটা, 'বিদুৎ-উৎসব' বাতাসের উদ্দামবেগ, মেঘের গুরুগুরু রব। মেঘের সেই গম্ভীর নির্ঘোষের মধ্যে কবি শুনেছেন বহু বরষের বিরহীর বিচ্ছেদ ক্রন্দন। কালের প্রাচীরকে ধ্বংস করে সেইদিন মেঘদূতের শ্লোকরাশির মধ্যে চিরদিবসের রুদ্ধ-অশ্রুজলকে ঝরে পড়তে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রিয়া-বিরহে কাতর যত বিরহীর গান 'তোমার সংগীতে/পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে/দেশে দেশান্তরে খুঁজি বিরহিনী প্রিয়া ?' কালিদাসের সেই 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' এরপর কত শতবার নববর্ষার স্নিগ্ধ দিবস পার হয়ে গেছে, প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নতুন জীবন শুধু নয়, 'নবঘনস্নিগ্ধ মেঘচ্ছায়া', নব নব 'জলমন্ত্রের' ধ্বনি।

সঙ্গিহীন কবি বহুকাল ধরে প্রিয়াহীন ঘরে আষাঢ়ের সন্ধ্যায় ক্ষীণদীপালোকে বসে মেঘদূত পাঠে নিমগ্ন হয়েছেন। বহুযুগের ওপার থেকে সেকালের মানুষের কলধ্বনি সমুদ্রে তরঙ্গের মতো যেন কাব্যপাঠে আত্মমগ্ন কবির কর্ণে এসে প্রবেশ করেছে। আর কবি ভারতের পূর্বে সেই শ্যামবঙ্গদেশে অবস্থান করছেন যেখানে কবি জয়দেব কোনো এক বর্ষা দিনে দেখেছিলেন 'শ্যামছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।'

আজকের কাজল কালো মেঘের ঘনঘটায় যে অন্ধকার দিবস, সেখানে দুরন্ত বাতাসের হাতছানি, অরণ্যের উদ্যত হাহাকার এবং বিদ্যুতের বক্র হাসি যেন শূন্যে আছড়ে পড়েছে। এই অন্ধকারময় পরিবেশে রুদ্ধদ্বার গৃহে কবি পড়ছেন মেঘদূত, তাঁর গৃহত্যাগী মন ছুটে যেতে চাইছে দেশ থেকে দেশান্তরে, আম্রকূট পর্বতের চূড়ায়, রেবা নদীতীরে, বিন্ধ্যপর্বতে, বেত্রবতীর কূলে, জম্বুবনচ্ছায়ে, কেতকীর বেড়া ঘেরা দশার্ন গ্রামে, যেখানে বিহগেরা বর্ষায় নীড় রচনা করতে ব্যস্ত, যেখানকার জনপদ বধূরা ভ্রূবিলাস শেখেনি, মেঘের ঘনঘটা দেখে যাদের নীল নয়নে ছায়া পড়ে, যেখানকার সিদ্ধাঙ্গানারা স্নিগ্ধমেঘ দেখে উন্মনা হয়ে উঠে গুহাশ্রয় খোঁজে, যেখানে দ্বিপ্রাহরিক অন্ধকারকে সন্ধ্যা মনে করে প্রণয় চাঞ্চল্য বিস্মৃত হয়ে পারাবতরা ভবনশিখরে আত্মরক্ষায় তৎপর হয়, যেখানকার রমণীরা শুধুমাত্র বিরহবিকারে প্রেমাভিসারিণী হয় অন্ধকার রাজপথ মধ্যে। কোথায় সেই ব্রহ্মবর্ত কুরুক্ষেত্র, কোথায় সেই কনখল যেখানে জহ্নুকন্যা যৌবন চাঞ্চল্যে গৌরীর ভ্রূকুটিকে অবহেলা করে পরিহাসছলে ধূর্জটির জটা ধরে খেলা করে। এইভাবে কবিমন মেঘরূপে দেশ-দেশান্তরে ভেসে শেষে কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে যেখানে বিরহিণী প্রিয়া তথা সৌন্দর্যের আদিস্রষ্টা বিরাজ করছে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই অমর ভুবনে মহাকবি কালিদাস ছাড়া আর কেই বা নিয়ে যেতে পারত ! সেখানে অনন্ত বসন্ত, নিত্য পুষ্পবনে নিত্যচন্দ্রালোক, সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে ক্রন্দনরতা বিরহিণী বসে। কালিদাসের প্রেম-মন্ত্রে আজ কবি-রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের যত বন্ধনের ব্যথা সব মুক্ত হয়ে গেছে। কবি আজ বিরহের স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়েছেন। এই বিরহের স্বর্গলোক কবির কাছে অনন্ত সৌন্দর্যের আধার।

বস্তুত মনুষ্যজীবন বন্ধনের ব্যথায় সর্বদাই কাতর। বন্ধন মানুষকে সংকীর্ণ সীমায় বন্ধ করে, মুক্ত প্রান্তরে

বিস্তীর্ণ করে দেন না। কবি আজ প্রিয়াবিরহে কাতর, কালের প্রাচীরে বন্ধ মন আজ মুক্তি পেয়েছে মেঘদূত পাঠে। কবি এখন বিরহের স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়েছেন। এই বিরহই জীবনের সত্য। যে বিরহিণী প্রিয়া, প্রিয়-বিরহে কাতর হয়ে অশ্রুমোচন করছে, সে প্রকৃতপক্ষে প্রতীক্ষা করছে, তার এই প্রতীক্ষায় আছে সাধনা। রবীন্দ্রনাথ একেই প্রেমের 'সাধনবেগ' বলেছেন। কালিদাসের 'মেঘদূত', 'পূর্বমেঘ' এবং 'উত্তরমেঘ' অর্থাৎ 'প্রতীক্ষা' এবং 'মিলন' এই দু'খণ্ডে বিভক্ত। যে প্রেমে প্রতীক্ষা আছে, যে প্রেম ত্যাগে বা সাধনায় মহিমাজ্জ্বল রূপলাভ করে সেখানেই থাকে প্রকৃত সৌন্দর্য। 'অলকাপুরী' তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেমের মোক্ষধাম, 'বিরহের স্বর্গলোক'—সৌন্দর্যের প্রাসাদপুরী। একসময় এই অলকাপুরী কবি-চিত্ত থেকে হারিয়ে যায় বাস্তবের অভিঘাতে। শুরু হয় বৃষ্টির অবিরাম ধারা। আর রোমান্টিক কবি অতল বেদনারাশি নিয়ে বিস্ময় ব্যাকুলভরে এই প্রশ্ন করেন—'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে/মানস সরসী তীরে বিরহ শয়ানে/রবিহীন মনিদীপ্ত প্রদোষের দেশে... ।' কবির সেখানে না যেতে পারাই বেদনার কারণ। একালের প্রাচীরে বন্ধ কবি কালিদাসের কালে কী করে যাবেন ? কবিমন উপস্থিত হতে পারলেও সশরীরে সেখানে যাওয়া তো কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কালের এই ব্যবধান কবিকে বেদনার্ত করেছে ....'মেঘদূত' কবিতায় তারই প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

৭.১.২ অনুশীলনী

১। 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কীভাবে নবমেঘদূতে রূপান্তরিত হয়েছে লিখুন।

অথবা 'মেঘদূত' কবিতাটি কোন্ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ? কবিতাটির মধ্যে এই কাব্যের মূল সুর কীভাবে ধরা পড়েছে দেখান।

অথবা 'মেঘদূত' কবিতায় রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের বিরহ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে—আলোচনা করুন।

৭.২ বসুন্ধরা

'সোনারতরী' কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা 'বসুন্ধরা'। আলোচ্য কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মর্তপৃথিবীর প্রতি গভীর ভালোবাসার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মাটির প্রতি দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় আকর্ষণ, মর্ত পৃথিবীর জল, হাওয়া, তৃণ-গুল্মলতার প্রতি তীব্র আসক্তি, রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবির বাল্যকালে যে প্রকৃতি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জানালার গরাদের ফাঁকফোকর দিয়ে ইসারায় কবিতে ডাকত কিন্তু কাছে পেত না ; সেই প্রকৃতিকেই কবি মুক্ত চিত্তে আলিঙ্গান করলেন শিলাইদহে পৌঁছিয়ে 'সোনার তরীর' অসামান্য কবিতাগুলি তাই এক অর্থে শিলাইদহের প্রকৃতির দান। একদা গরাদে বন্ধ কবির মুক্ত প্রকৃতির প্রতি প্রণয়ের আকর্ষণ প্রবল থাকা সত্ত্বেও যা মিলনে পর্যবসিত হওয়া সম্ভব ছিল না, জীবনের পরিণত পর্বে শিলাইদহের সেই গ্রাম্য প্রকৃতির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আস্বাদ করে কবি প্রাণ তৃপ্ত হল। সেই প্রশান্ত প্রাণে কবি সুন্দরী প্রকৃতির যে বর্ণনা দিলেন তা 'ছিন্নপত্রাবলী'র পৃষ্ঠা থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে :

> 'ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন
> ভালোবাসি ! ওর এই গাছপালা, নদী, মাঠ, কোলাহল,
> নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা, সমস্তটা সুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।'

প্রকৃতির প্রতি এই ভালোবাসা, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে নিজেকে প্রসারিত করে দেবার আকাঙ্ক্ষাই ঘোষিত হয়েছে 'বসুন্ধরা' কবিতায়। বসুন্ধরার সঙ্গো কবির জননী সন্তানের সম্পর্ক। জননী বসুন্ধরার ক্রোড়ে কবি ফিরে যেতে চেয়েছেন, অনুভব করেছেন তার সঙ্গো নাড়ির যোগ। বসুন্ধরার সঙ্গো কবির পরিচয় জন্ম-জন্মান্তরের। জননী বসুন্ধরার উদ্দেশে কবি তাই বললেন—

> আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,

কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে।'

সৌন্দর্যপিপাসু কবি জীবনের সংকীর্ণ প্রাচীর ভেঙে, নিরানন্দ অন্ধ কারাগার ভেদ করে তৃণ গুল্মপত্রের সরস জীবন রসে মিশে যেতে চেয়েছেন, স্পর্শ করতে চেয়েছেন 'শস্যক্ষেত্রতল'। মহাসিন্ধুর তীরে তীরে কবি-মন নৃত্যে সংগীতে হিল্লোল তুলতে চাইছে।

কবি কল্পনার সাহায্যে উদ্দাম-উন্মুক্ত প্রকৃতি প্রান্তরে গেছেন, প্রকৃতির উদার প্রবাহের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধ হৃদয় দেশ-দেশান্তরের পানে ছুটে যেতে চেয়েছে। কবি গৃহকোণে বসে লুব্ধ চিত্তে কৌতূহল বশে অধ্যয়ন করেছেন সেই সমস্ত মানুষের কথা যারা দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে ফিরেছেন একদা, কবি যেন তাদেরই সঙ্গে মনে মনে কল্পনার জাল বুনে এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাত্রা করেছেন। মহাপিপাসার রঙ্গভূমি সেই দুর্গম প্রদেশের পথহীন, তরুহীন সীমাহীন প্রান্তরের ধূলিশয্যার উপর কবি জ্বরাতুরা, শুষ্ককণ্ঠ, একাকী বসুন্ধরাকে যেন পড়ে থাকতে দেখলেন। অথচ কবি বাতায়নে বসে বসে এতদিন বসুন্ধরার যে ছবি এঁকেছিলেন সেখানে স্ফটিক স্বচ্ছ নীলাকাশ, নীল সরোবর, শৈলমালা, মেঘখণ্ড বসুন্ধরাকে যেন শিশুর মতো আঁকড়ে ছিল। নীল গিরিপর্বতমালার হিমরেখা যেন স্বর্গভেদ করে পৌঁছিয়েছে যোগমগ্ন মহাদেবের তপোবন দ্বারে। কবি মানসভ্রমণ করেছেন সুদূর সিন্ধুপারে, যেখানে ধরণি অনন্ত কুমারী ব্রত ধারণ করে, হিমবস্ত্রে আভরণহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যেখানে 'অনন্ত আকাশে/অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত / শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।' কবি মন পর্বতসংকটে একখানা ছোট্টগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখানে নদীর তীরে পড়ে আছে জাল, তরী ভাসছে জলে, জেলে ধরছে মাছ ; আর গিরির মাঝ দিয়ে চলেছে নদী। কবির ইচ্ছে করে সুখাচ্ছন্ন সেই গৃহগুলিকে বাহুপাশে আঁকড়ে ধরতে। দুর্দম আরব সন্তান হয়ে স্বাধীনভাবে মরুতে মরুতে বিচরণ করতে ইচ্ছে করে কবির, স্বজাতি হয়ে সবার সঙ্গে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে সাধ হয় তাঁর। তিব্বত, পারসিক, প্রাচীন, চীন, জাপান....যেখানে নেই কোনো ধর্মাধর্ম, নেই প্রথা, নেই দ্বন্দ্ব, যেখানে আপন-পর ভেদ নেই, যেখানে 'উন্মুখ জীবনস্রোত বহে দিনরাত', যেখানে 'বৃথাক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে/ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়/বর্তমান তরঙ্গের চূড়ার চূড়ায়/নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি'...সেই সতেজ, নির্ভীক, শিষ্টাচার দেশে জন্ম নিতে ইচ্ছা করে কবির ; সে জীবন উচ্ছৃঙ্খল হলেও কবি তাকেই ভালোবাসেন।

কবি-প্রাণ সব সময়ই সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। নগরকলকাতার বাসিন্দা কবি যখন পরিচিত শহর ছেড়ে শিলাইদহের প্রান্তরে এসে প্রকৃতির নিষ্কলঙ্ক রূপ পরিদর্শন করলেন তখন এতদিনকার অভ্যস্ত প্রতিবেশ, সেখানকার মানুষ, দৈনন্দিন জীবন সবই কবির কাছে তুচ্ছ হয়ে ধরা পড়ল। প্রকৃতি জননী কত উদার, কত সুন্দর, কত নির্মল তা কবি প্রত্যক্ষ করলেন এবং প্রকৃতির সেই স্নেহময়ীরূপ দেখেই কবি ঘুম ভেঙে 'সোনার তরী'তে উঠে বসলেন, আহ্বান করলেন মানসসুন্দরীকে, আর ব্যাকুলকণ্ঠে জননী বসুন্ধরার উদ্দেশে বললেন : 'আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে'। শূন্য প্রকৃতি প্রান্তর কবিকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে গেল মহাজ্যোতিষ্কের পথে এই নক্ষত্রের দেশে।

'বসুন্ধরা' কবিতাটি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রীতির একটি বড় পরিচয়। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত ও মিশ্রিত করে দিয়ে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের প্রতিটি অবস্থার সৌন্দর্য ও রস পান করবার জন্য কবি আকুল হয়েছেন। নিখিলের বিচিত্র আনন্দ কবি সকলের সঙ্গে এক হয়ে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে এক-আত্মা, এক-দেহ হয়ে জীবনের অন্তহীন রসোপলব্ধির পিপাসা মেটাতে উৎসুক। তিনি কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, তরু-লতা হয়ে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে ধরিত্রীর স্তনসুধা পানের জন্য ব্যাকুল। তিনি জানেন

একই প্রাণ জড়জগৎ, প্রাণীজগতের মধ্যে দিয়ে বিকাশের স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। এখানকার নদী-গিরি-সমুদ্র-আকাশের সৌন্দর্য ও সংগীত কবির মনকে আনন্দে মাতোয়ারা করে। কবি তাঁর এই আবেগময় অনুভূতিকে কাব্যের ঐশ্বর্য দান করেছেন। এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মা বোধের মূল প্রেরণা। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গো একাত্মতা হওয়াতেই কবি-প্রাণের পরম শান্তি—'বসুন্ধরা' কবিতায় তারই প্রকাশ।

৭.২.১ অনুশীলনী

১। 'বসুন্ধরা' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মাবোধের পরিচয় দিন।

২। 'বসুন্ধরা' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতির পরিচয় দিন।

৭.৩ জীবনদেবতা

'চিত্রা' কাব্যের একটি অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা হ'ল জীবনদেবতা'। এই কাব্যে 'অন্তর্যামী' কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্পষ্টভাবে তাঁর জীবনে মহাশক্তির লীলার কথা বলেছেন। কবির অন্তরবাসিনী কবিকে নিয়ে এক কৌতুকে মেতেছেন। কবি যা কিছু রচনা করেছেন তাতে তাঁর কোনো আত্মকর্তৃত্ব নেই, তাঁর অন্তর্যামী—'অন্তর মাঝে বসি অহরহ/মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ/মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ/মিশায়ে আপন সুরে।' এই অন্তর্যামী 'জীবনদেবতা' কবিতায় কবির জীবনদেবতা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনও বলেছেন 'জীবনদেবতা', কখনও বা 'জীবননাথ'। কবির এই জীবনদেবতাকে নিয়ে সমালোচক মহলে বিতণ্ডার শেষ নেই। কিন্তু কবি যখন স্বয়ং এই জীবনদেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন, তখন সেই তত্ত্বে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।

জীবনদেবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আত্মপরিচয় প্রবন্ধে কবি 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতা থেকে কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধার করেছেন। কবিকে দেওয়া জীবনদেবতার সম্পদ তিনি ফিরে পেয়েছেন অন্যভাবে। আপনার দুঃখ ও আনন্দ সবকিছুই তিনি তুলে দিয়েছেন ঐ জীবনদেবতার করপুটে ! এই জীবনদেবতা কবির জীবননাথ। কবির জীবনে, তাঁর সুখ-দুঃখের মধ্যে লীলাময় রূপে বিরাজ করেছেন। কবি তাঁকে 'বঁধু' ও 'কবি' বলেও সম্বোধন করেছেন। সর্বোপরি এই জীবনদেবতার সঙ্গো গড়ে উঠেছে কবির বিবাহবন্ধন—

'নূতন করিয়া লহ আরবার
চিরপুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমা নবীন জীবন ডোরে।'

'চিত্রা' কাব্যের নাম কবিতায় কবির জীবন দেবতা এসেছে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপ ধরে। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবির কাছে দুইভাবে প্রকাশিত—জগতের মাঝে যিনি বিচিত্র রূপিণী, তিনিই কবির অন্তরবাসিনী। এই বিশ্বসৌন্দর্য লক্ষ্মীকে যখন কবি দেখলেন, তখন লাভ করলেন নবজন্ম। কবির সঙ্গো তাঁর অন্তরবাসিনীর এই ভালোবাসা শুধু ব্যক্তিগত অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বচেতনার সঙ্গো কবি চেতনার সংযোগ সাধন। তাঁর কাছে কবি নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেন 'অকুল শান্তির আশায়'। কবি এই অন্তরবাসিনীকে কৌতুকময়ী আখ্যা দিয়েছেন। কৌতুকময়ীর সংগীতস্রোতের কুল দেখতে না পেয়ে কবি শেষ পর্যন্ত বিস্ময়ে হার মেনেছেন। কৌতুকময়ীকে তিনি বলেছেন 'আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী'। শেষে এই কৌতুকময়ীর চরণে ঘটেছে কবির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। অতঃপর কবিকণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে—

'ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস

আসি অন্তরে মম।'

এই কৌতুকময়ীই কবির জীবনদেবতা। কিন্তু কবির এই অন্তরতম জীবনদেবতা কে ? এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—'চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থলাভিষিক্ত নয়।' কবির মনোলোকের আদর্শ প্রেরণাকেই কবি বলেছেন 'অন্তরতম'। রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতাকে শুধু কেবল তাঁর কাব্য প্রচেষ্টার নিয়ামক বলে মনে করেন নি, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে জীবন-দেবতা তাঁর জীবন-সূত্রটি ধরে আছেন এবং সুখ-দুঃখ, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দিয়েছেন।

চারটি স্তবকে বিন্যস্ত 'জীবনদেবতা' কবিতায় কবি তাঁকে অন্তর্যামী তথা অন্তরতম বলে সম্বোধন করেছেন। কবি জানতে চেয়েছেন, কবিচিত্তে তাঁর আবির্ভাব হওয়ার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিনা। এখানে জীবনদেবতাকে নায়ক রূপে কল্পনা করে তাঁর পৃথক সত্তা মেনে নিয়ে কবি তাঁর প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করেছেন। দ্রাক্ষাসম আপন বক্ষদেশকে কবি তাই নিষ্ঠুর পীড়নে পীড়িত করেছেন। হৃদয়ের সমস্ত কামনা-বাসনা পুড়িয়ে কবি নিজেকে খাঁটি বিশুদ্ধ সোনায় পরিণত করেছেন। জীবনদেবতার সঙ্গে ক্ষণিক খেলায় কবি মেতেছেন। তাঁর সঙ্গে খেলার জন্য নিত্যনতুন রূপ সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় স্তবকে কবির জীবনদেবতা কেন তাঁকে আপনার লীলাক্ষেত্রে বরণ করেছেন তা কবি জানেন না। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর কর্ম ও নর্ম জীবনদেবতার তৃপ্তিসাধন করতে পেরেছে কিনা। তাঁর আরও জিজ্ঞাসা, জীবনদেবতা কি তাঁর সৌন্দর্যময়ী জীবন উদ্যানে ভ্রমণ কারে যৌবনকুসুমগুলি তুলে নিয়ে গলায় পরিধান করেছেন ?

তৃতীয় স্তবকে কবি আপন স্খলন, পতন, ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এখানে তিনি জীবনদেবতাকে 'বঁধু' বলে সম্বোধন করেছেন। কবি মনে করেন, তাঁর জীবনদেবতা তাঁকে দিয়ে যে রাগিণী ধ্বনিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তা যেন কবি ঠিকমতো রচনা করতে পারেননি। সর্বশেষ স্তবকে কবি তাঁর জীবনদেবতাকে নতুন রূপে তাঁকে গড়ে নিতে বলছেন। জীবনদেবতার সঙ্গে কবির জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক, তাই চির-পুরাতন কবিকে তিনি যেন নতুন করে নতুনভাবে তাঁকে গড়ে নিয়ে নতুন বিবাহ ডোরে যেন বাঁধেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র স্বরূপ সন্ধানে অগ্রসর হয়ে 'চিত্রা' কাব্যের 'সিন্ধুপারে' কবিতাটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এক অপ্রাপনীয় সৌন্দর্য সন্ধানে কবি যাত্রা করেছেন 'সিন্ধুপারে', 'পৌষের রাতে' এক অবগুণ্ঠনবতীর অঙ্গুলি সংকেতে। অজানা এক নতুন দেশে কবি এলেন জনহীন এক প্রাসাদপুরীতে, যেখানে নীরবে সেই রহস্যময়ী কবিকে তাঁর পাশে বসালেন। তাঁর স্পর্শে কবির 'হিম হয়ে এলো সর্বশরীর শিহরি উঠিল প্রাণ'। কবি সেই অবগুণ্ঠনবতীকে প্রশ্ন করলেন 'কে তুমি নিদয় নীরবললনা কোথায় আনিলে দাসে ?' সে কথার উত্তর না দিয়ে অবগুণ্ঠনবতী কবির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ; প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল বিজন প্রাসাদ। কবি ব্যাকুল হয়ে জানালেন মণিবেদিকায় উপনিতা সেই রমণীকে—'সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু।' অতঃপর কৌতুকময়ী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে কবির সামনে দাঁড়ালেন। কবিকণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হল এই বলে—'এখানেও তুমি জীবনদেবতা ?' আদর্শ সৌন্দর্য চিরকালই অপ্রাপনীয়। একদা কীটসও সৌন্দর্যের সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন নাইটিঙ্গেলের উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথও যাত্রা করেছেন সেই সৌন্দর্যের অভিলাষে। এই যাত্রায় যত বেদনা, ততই প্রেমের উৎকর্ষ। সেই আনন্দ বেদনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর 'চিত্রা' কাব্য।

বস্তুত কবির অন্তরে যিনি কবি, যিনি দুঃখ সুখের বিচিত্র সম্পদের আপনার চেয়ে আপন তিনিই কবির জীবনদেবতা। 'The Poetic personality within the Poet'—এই জীবনদেবতা শুধু রবীন্দ্রনাথের আপন সম্পদ নন, প্রতিটি মানুষের অন্তরে রয়েছে তাঁর স্থান। অতএব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবনদেবতা নিঃসন্দেহে

কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কবিসত্তা। মূর্তিমান 'Artistic Tallent', যাকে ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট করা যায় না, তা শুধু অনুভববেদ্য। এই মূর্তিমান কবি প্রতিভা, যা কবির সৃষ্টি লীলায় বাঙ্ময়। জীবনের উপান্তপর্বে 'পূরবীর' লীলাসঙ্গিনী কবিতায় ফিরে এসেছিলেন কি তিনিই? কোনো কোনো সমালোচকের মতে, এই জীবনদেবতা আত্মপ্রকাশ করেছেন 'পূরবীর' 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায়। অনেকের মতে, কবির জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার নামান্তর। কিন্তু কবি নিজে জীবনদেবতাকে শুধু আত্মানুভূতি হিসেবেই দেখেননি। আপনার গভীরতম সত্তাকে কবি বিশ্বের জল-মাটি-হাওয়ার মধ্যে অনুভব করতে চেয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে একটি বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়, মরমী কবির কাব্যের বৈশিষ্ট্যের অঙ্গমাত্র। তাই 'চিত্রার' জীবনদেবতা একাধারে 'অন্তরতম' এবং লীলাসঙ্গিনীও বটে। তিনিই 'কৌতুমময়ী', তিনিই 'জীবনদেবতা', তিনি 'বধূ', সৌন্দর্যলক্ষ্মী, লীলাসঙ্গিনী, কবির অন্তরবাসিনী। 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'লীলা' শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে।' সুতরাং 'লীলা' শব্দটির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিতত্ত্বও বোঝাতে চেয়েছিলেন। জগৎ স্রষ্টা লীলাময় এবং সেই রকম সাহিত্য স্রষ্টাও। অতএব 'লীলাসঙ্গিনী' বলতে কবির সৃষ্টি কর্মের যিনি সহচরী তাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং এই জীবনদেবতা কবির জীবনের সৃষ্টি সহচরী, 'গোপনতরঙ্গিনী' এবং 'রসতরঙ্গিনী'। এই কবিসত্তাই কবির জীবনদেবতা।

৭.৩.১ অনুশীলনী

১। 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতার জীবনদেবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করুন।

২। 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতাটির মূল ভাব ব্যক্ত করুন।

৩। 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতার জীবনদেবতা কে? এই জীবনদেবতার সঙ্গে কি পুরবীর 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতার কোনো যোগ আছে?—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৭.৪ স্বপ্ন

'কল্পনা' কাব্য রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের এক অমূল্য সম্পদ। 'কল্পনা' কাব্যের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়বস্তু হল এই কাব্যের রূপনির্মাণ এবং সংস্কৃতের স্বাদ। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ অনুরাগ 'স্বপ্ন' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কালিদাসের কালের একটি অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এ কবিতায়।

ছটি স্তবকে বিভক্ত 'স্বপ্ন' কবিতাটিতে কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথকে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই প্রভাবিত করেছিল। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সমালোচকেরা বলে থাকেন যে, কালিদাসের সর্বস্ব হল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শকুন্তলার প্রভাব 'মানসী'র 'কুহুধ্বনি' কবিতায় গ্রহণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'শকুন্তলা'র চেয়েও 'মেঘদূত'-এর প্রভাবই সমধিক। একালের কবি রবীন্দ্রনাথ উজ্জয়িনীর কবি কালিদাসের সঙ্গে রোমান্টিক ভাব সাযুজ্য অনুভব করেছেন। 'স্বপ্ন' কবিতাটি লেখা হয় বোলপুরে ৯ই জৈষ্ঠ তারিখে। কবিতাটির মধ্যে বর্ষার কাব্য 'মেঘদূতের' স্মৃতি আছে, অথচ কবিতার রচনাকাল বর্ষা নয়। বস্তুত কবি কল্পনা এমন একটি শক্তি, যা পাঠককে অনায়াসে একাল থেকে সেকালে আকর্ষণ করে। কবিতার বিভিন্ন অংশে 'মেঘদূতে'র ছাপ আছে। কবি মনে করেন তিনি জন্মজন্মান্তর ধরে বর্তমান আছেন। কালিদাসের কালেও তিনি ছিলেন। এ যুগে তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে স্বপ্নে শিপ্রানদীতীরে উজ্জয়িনীপুরে তাঁর পূর্বজন্মের প্রিয়ার সন্ধানে অভিসার করেছেন। এই নারীর রূপ বর্ণনা করেছেন

রবীন্দ্রনাথ অলকার নায়িকার রূপানুসারে। তাঁর প্রিয়া সে যুগের বেশ-বাস ও প্রসাধনে সুসজ্জিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল বটে, কিন্তু সে ভাষা ভুলে যাওয়ায় তাঁদের বাক্যালাপ হল না—কেবল দৃষ্টি বিনিময়ে মুখের ভাবে ও দেহের স্পর্শে তাঁদের প্রণয় ব্যক্ত হল—

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি
'হে বন্ধু আছতো ভালো ?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু—কথা আর নাহি।'

দ্বিতীয় স্তবকে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের কথা আছে। আছে মঙ্গলচিহ্ন যুক্ত প্রেয়সীর ভবনের কথা, রয়েছে কপোতের কথা। পরবর্তী স্তবকে আছে মালবিকার উল্লেখ এবং মহাকাল মন্দিরে সন্ধ্যারতির প্রসঙ্গ।

তৃতীয় স্তবকে চন্দনের পত্রলেখা বহন করে গায়ে উতলা নিশ্বাস ফেলে যার আবির্ভাব হল তার কথা কিন্তু 'মেঘদূতে' নেই। আছে রবীন্দ্রনাথেরই অন্তরে, যেহেতু সেই নায়িকা কালের নয়, একালের। তাই কবিকে সে প্রশ্ন করেছে শব্দহীন ইঙ্গিতে, 'হে বন্ধু আছ তো ভালো ?' এই নায়িকা যক্ষবধূর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতা এবং একালের কবির প্রেয়সী নয়, কবির জন্ম-জন্মান্তরের পূর্বেকার প্রেয়সী। তাই কারুরই অপরের নাম মনে নেই। চতুর্থ স্তবকে দুজনে তরুতলে দাঁড়িয়ে অনেক ভাবনার পর পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিবিনিময় পূর্বক 'অবারে ঝরিল অশ্রু নিষ্পন্দ নয়ানে।'

পঞ্চম স্তবকে সেই নায়িকা তার পূর্বজনমের প্রেমিকের হাতে হাত রেখেছেন এবং নত বৃন্তপদ্মের মতো প্রেমিকের বক্ষে নামিয়েছেন মুখখানি। উভয়ের নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিলন হল—'ব্যাকুল উদাস/নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।' সর্বশেষ স্তবকে যেন মোহঘোর অবলুপ্ত, হারিয়ে গিয়েছে উজ্জয়িনী। মনের পট থেকে দূরে সরে গিয়েছে শিপ্রানদী তীরে আরতির ধ্বনি। বস্তুত কল্পনার লীলায় একালের কবি ছিলেন সেকালে, কিন্তু যেহেতু তা কল্পনাই, সুতরাং বর্তমানের স্বপ্ন চুরমার হয়ে কবি বাস্তবের মাটিতে ফিরে এলেন। কবিতাটির নামও তাই স্বপ্ন ! এ যেন বাস্তবের নয়, কল্পনা বিলাসীর স্বপ্নের জগতের পরিভ্রমণের কবিতা।

৭.৪.১ অনুশীলনী

১। 'স্বপ্ন' কবিতায় রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা করুন।

২। কালিদাসের কালের অপূর্ব স্মৃতি 'স্বপ্ন' কবিতায় কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে দেখান।

৩। 'স্বপ্ন' কবিতায় কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের যে প্রভাব অনুভূত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭.৫ উদাসীন

'ক্ষণিকা' কাব্যের একটি অন্যতম প্রধান কবিতা 'উদাসীন'। এই কবিতায় কবি সহজ জীবনের সহজ আনন্দটুকু উপভোগ করতে চান। জগৎ ও জীবনের মোহ থেকে মুক্ত মন সকল বন্ধন ভেঙে ফেলে মনের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছেন। সমস্ত কর্ম বন্ধন থেকে রেহাই মিলেছে তাঁর, তিনি এখন ছুটি পেয়ে এসে উঠছেন খেলা ঘরে। তিনি জীবনে কোনো সুযোগ-সুবিধার আশায় বসে থাকেন না, নিজে যেটুকু পেয়েছেন, তাতেই তিনি

তুষ্ট, পরের জিনিসে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। জীবনের সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে কবি এক সহজ জীবনে প্রবেশ করেছেন, এখানে কেবলই মুক্তি ও আনন্দ।

জীবনের তরীখানি কোনো এক অদৃশ্য কাণ্ডারীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। আমরা যখন নিজেরা তার হাল ধরার চেষ্টা করি তখন নান বিপর্যয় এসে হাজির হয়। তাই কবি হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকাটিকে তার মতন চলার সুযোগ করে দিয়েছেন। জগতের কোনো কিছুর প্রতি তাঁর মন আসক্ত নয়, তিনি বৈরাগীর উদাসীন দৃষ্টিতে জগৎকে দেখেছেন। এখন তাঁর দৃষ্টি মোহমুক্ত স্বচ্ছ ও সহজ। জীবনপথে চলতে চলতে মানুষ নানা সুযোগের অপেক্ষা করে, কিন্তু সন্ন্যাসী কবি সে-সব থেকে দূরে অবস্থান করেন, কোনো কিছুর খেয়াল না করে এগিয়ে চলেন। উন্নতকামী মানুষের মতো কবি সব সময় উপরে ওঠার খেলায় না মেতে, সে পথ এড়িয়ে চলেন। বস্তুত কবি সেই উদাসীন মানুষ, যিনি উপরে ওঠার সুবিধা না পেলে নীচে পড়ে থাকতেও তাঁর আপত্তি নেই।

যেটুকু সহজ ভাবে আসে কবি তাকেই পেতে চান। যেখানে কিছু দেবার আছে বা জানবার আছে তাকেও দেখতে-জানতে চান সহজভাবে। তাইতো কবি বলেছেন 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।'—এটাই ক্ষণিকার জীবনদর্শন। কোনো কিছুকে জোর পূর্বক আঁকড়ে ধরার ইচ্ছে তাঁর নেই, তাই যা কিছু হাত ছাড়া হয়ে যায় তাকে তিনি নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেন। কারও কথা শোনার ধৈর্যও যেমন তাঁর নেই, কারুকে কথা শোনাবার দায়ও তাঁর নয়। সুখকর হোক বা দুঃখকর—যে-কোনো স্মৃতিই মানুষের অনেক কথাকে ধরে রাখে। সেই সব স্মৃতি কখনও বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে উঠে আসে মানুষের মনে। কিন্তু কবির মনের মধ্যে লীন হয়ে থাকা যে সকল স্মৃতি আছে তাকে তিনি তুলে আনতে চান না। সাধারণত প্রেমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মন দেওয়া নেওয়াতেই মানুষের তৃপ্তি—যদি মনের মতো মানুষ মেলে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় জীবনে বিপরীতটাই ঘটে। প্রেমের ছলনায় মানুষ বারবার ভুল করে, আঘাত পায়, আঘাত দেয়। এই কারণে কবি মনের কারবারে রাজি নন—দীর্ঘজীবনে নানা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কবি প্রেমের অসারতা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হয়েছেন, তাই তিনি মানুষের মনের গতিপ্রকৃতির অনুসরণ করতে চান না। অন্যর হৃদয়ে স্থান পাবার আশায় তিনি হৃদয় দুয়ারে আঘাত করেছেন বারংবার, সাধ্য-সাধনাও করেছেন অনেক, এমনকী অশ্রুবিসর্জনও করেছেন একদা, কিন্তু এসব কিন্তু মানুষকে কখনই স্থায়ী শান্তি দিতে পারে না বলে উপলব্ধি হয়েছে তাঁর। তিনি মনে করেন, এভাবে কখনও প্রেম মেলে না। তবু মানুষ প্রেমের ছলনায় ভুল করে পথভ্রষ্ট হয়।

জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কবি ছুটির আনন্দে বিভোর। জীবনের সকল দায়দায়িত্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার হাত থেকে মুক্ত হয়ে কবি খেলার আনন্দে মেতেছেন। কবি এখানে জগৎকে খেলার দৃষ্টিতে দেখেছেন, এবং ঠিক ভাবে খেলে যেতে পারলেই জীবনের সহজ সুরটা চিরকাল অব্যাহত থাকবে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় কোনো শেষ নেই, সীমা নেই—তা কখনোই সম্পূর্ণ পূরণ হয় না। ফলে ব্যর্থতার বেদনায় মানুষ কাতর হয়, আশাহত হয়। কিন্তু আজ কবির মনে কোনো আশা নেই, তাই বুকভাঙার কোনো অবকাশও নেই। যা কিছু ভুলে যাওয়ার তাকে তিনি একেবারে ভুলে যেতে চান—কারণ স্মৃতি সব সময়ই বেদনাদায়ক ; বিস্মৃতি সেখানে শান্তি নিয়ে আসে। জগৎ স্রষ্টা নানা বন্ধনের বেড়ি পরিয়ে আমাদের পৃথিবীতে পাঠান, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার শৃঙ্খলে বেঁধে তিনি আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীন গতিকে রুদ্ধ করেন। কবি আজ সেই সব বেড়িকে ভেঙে ফেলে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন।

প্রকৃতিতেও বসন্তকালে ফুলের যে শোভা দেখা যায় তা উপলব্ধ হবে না যদি সঞ্চয়ের নেশা আমাদের পেয়ে বসে। বস্তুত সঞ্চয়ের মনোভাব মানুষকে জীবন ও জগৎকে উপভোগ করতে দেন না। হিসেবি মানুষের কাছে জীবনের সহজ রূপ ও রস কোনোটাই ধরা দেয় না। কবি আজ সেই ভুল সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। কবি

এখানে ভ্রমরের উদাহরণ এনে জানিয়েছেন, ভ্রমর মধু সঞ্চয়ের জন্য ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য দেখে না। মধুপিয়াসী কবিও তেমনি জীবনে সঞ্চয় করতে গিয়ে জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আলস্যে জীবনের কত বকুল, কত মুকুলকে তিনি দলিত মথিত করেছেন—আজ তাই তিনি সব থেকে দূরে সরে গেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি জীবনকে দেখেছেন, জগৎকে দেখেছেন এবং এই দেখার মুহূর্তে তিনি লক্ষ করেছেন ত্রিভুবন তাঁকে অনুসরণ করছে। পুষ্পকে স্বাভাবিকভাবে ফুটতে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব, তাকে চেষ্টা করে ফুটিয়ে তোলা যায় না, আবার মুঠিতে চেপে ধরলে তা মলিন হয়ে যায়। এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করে কবি আজ সব কিছুর ওপর থেকে বাসনার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাদের স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক হয়েছেন। কবি স্পষ্ট করে বলেছেন 'বড়ো যদি হতে চাও ছোট হও তবে'। তাই তো তিনি জীবনের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সহজ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বস্তুত 'ক্ষণিকা' আপাতদৃষ্টিতে হালকা সুরের কাব্য মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে সেই হালকা সুরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জীবনের অনেক পথ পাড়ি দিয়ে কবি উপলব্ধি করেছেন, সহজতাই জীবনের মূল মন্ত্র। এই সহজ সুরের সাধনায় কবি ব্রতী হয়েছেন এখানে। 'উদাসীন' কবিতাটি 'ক্ষণিকা' কাব্যের মূল সুরকে তুলে ধরেছে—এখানেই কবিতাটির সার্থকতা।

৭.৫.১ অনুশীলনী

১। 'উদাসীন' কবিতায় 'ক্ষণিকা' কাব্যের মূল সুর কীভাবে ধ্বনিত হয়েছে আলোচনা করুন।

২। 'উদাসীন' কবিতায় কবির যে জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে তা দেখান।

৭.৬ আগমন

রবীন্দ্রনাথের ভগবদচেতনার এক নতুন কাব্যফসল হল 'খেয়া'। 'খেয়া'র 'আগমন' কবিতায় এই কাব্যের মূল সুর ভগবদভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্য-নাটকে রাজার নানা মূর্তির ছবি আঁকা আছে। রাজার চরম এবং পরম উভয় মূর্তিই সেখানে লক্ষিত হয়। তবে 'রাজা' সাংকেতিক অর্থেই বেশি ব্যবহৃত। 'ডাকঘর', 'রাজা' প্রভৃতি নাটকে 'রাজা' 'পরমাত্মা' বিশেষ। 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা'র রাজা মূলত প্রশাসক। 'খেয়া'র আগমন কবিতায় কবির সেই প্রিয়তম রাজার আগমন ঘটেছে রুদ্রমূর্তিতে। স্বয়ং কবি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন—'খেয়াতে 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে ? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করেন নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘ গর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।' বস্তুত 'আগমন' কবিতায় এই অশান্ত রাজার আগমনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

ছ'টি স্তবকে বিন্যস্ত 'আগমন' কবিতায় 'আঁধার ঘরের রাজা'র আগমনের কথা বলা হয়েছে। তিনি আঁধার রাতে আসেন, মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটাতে। রবীন্দ্র-ভাবনায় রাজার বিভিন্ন Concept ধরা পড়ে। তার মধ্যে 'আঁধার ঘরের রাজা' অন্যতম। 'রাজা' নাটকের রাজাও অন্ধকারেই দেখা দিয়েছিলেন রানী সুদর্শনাকে। তিনি যেমনি কঠিন, তেমনি কোমল। তার এক পদপাতে ধ্বংস, অন্য পদপাতে সৃষ্টি। এখানেও সেই রাজার কথা আছে। রাতে যখন সবাই দ্বার দিয়ে নিদ্রার আয়োজন করছিল তখন দু' একজন বলেছিল 'আসবে মহারাজ।'

অন্যদিকে 'সবাই তখন ভেবেছিল 'আসবে না কেউ আজ।' এখানে স্পষ্ট ঈশ্বর-আগমনের কথা বলা হয়েছে। আসলে ঈশ্বরানুভূতি বা ঈশ্বর উপলব্ধি সকলের হয় না, দু' এক জনেরই হয় এবং নিশ্চিত ভাবেই হয়। তাই দু' একজন বলেছিল স্থির বিশ্বাস রেখে যে 'আসবে মহারাজ'। কিন্তু অবিশ্বাসীর দল মনে করেছিল 'আসবে না কেউ আজ।' দ্বারে করাঘাত হয়েছিল, কিন্তু সবাই মনে করেছিল 'বাতাস বুঝি হবে'। নিশীথরাতে শোনা গিয়েছিল কোনও একটা শব্দ, ঘুমের ঘোরে সবাই ভেবেছিল বোধহয় মেঘের গর্জনধ্বনি। মাঝে মাঝে ধরণি কেঁপে কেঁপে উঠেছিল, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা বলেছিলেন এ বুঝি রাজার রথচক্রের ঝন্‌ঝনানির শব্দ। কিন্তু যারা ঘুমিয়েছিল তারা বলেছিল এ হল 'মেঘের গরজনি।' তখনো রাত ফুরায়নি, এমন সময় বেজে উঠল ভেরী, কেউ যেন বলে গেল, আর দেরি নেই, তিনি আসছেন। সর্বত্র রব পড়ে গেল, মালা এলো, আলো এলো—আয়োজন শুরু হল। কিন্তু কোথায় সিংহাসন, কোথায় সভা, কোথায় কি ! আসলে তারা তো বিশ্বাস করতেই পারেনি যে রাজা আসবেন। তাই কোনও আয়োজনও করেনি। কিন্তু সর্বজ্ঞরা বলেছিল—'বৃথা এ ক্রন্দন / রিক্ত করে শূন্য ঘরে / করো অভ্যর্থনা'। কবিতার অন্তিম স্তবকে রাজার আগমন বার্তা পাওয়া গেল। চারদিকে শঙ্খধ্বনি বাজছে : 'বিদ্যুৎ ঝিলিক হানছে, ছিন্ন শয্যা দিয়েই আঙিনা সাজানো হচ্ছে। এমন সময় ঝড়ের সঙ্গে হঠাৎ এলেন 'দুঃখ রাতের রাজা'।

বস্তুত সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা আলস্যে জীবন কাটাতে পারলেই খুশি থাকে। তাই তারা যখন শুনল রাজা আসবেন তখন সেকথা বিশ্বাস করতে পারল না, আরামের শয্যা ত্যাগ করে তারা তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করবে, এটাও তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। আসলে তারা অবিশ্বাসী। কিন্তু তিনি 'দুঃখরাতের রাজা', তাই অন্ধকার রাতেই তাঁর আগমন ভক্তের গৃহে। তিনি ঝড়ের মতন, যখন আসেন তখন তাণ্ডব নামে প্রকৃতিতে, তাই ধরণি কেঁপে ওঠে তাঁর রথচক্রধ্বনিতে। 'রাজা' নাটকেও রানী সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মিলন হয়েছিল অন্ধকার ঘরেই—'আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।' আসলে রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি সে সত্য নয়। তাই বাস্তবে শান্তি আনয়ন করতে গেলে অশান্তি রূপ ভগবান তথা রাজার রুদ্রমূর্তিরই প্রয়োজন—'খেয়া'র 'আগমন' কবিতায় কবি সেই সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

৭.৬.১ অনুশীলনী

১। খেয়ার 'আগমন' কবিতায় কার আগমনের কথা বলা হয়েছে ? তাঁর আগমন কীভাবে হল বর্ণনা করুন।

২। 'আগমন' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্ চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন।

৭.৭ অপমানিত

'অপমানিত' গীতাঞ্জলির ১০৮ সংখ্যক গান, 'সঞ্চয়িতায়' 'অপমানিত' নামে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটিতে কবির ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে স্বদেশ প্রেম যুক্ত হয়েছে। 'অপমানিত' গীতাঞ্জলির একটি বিখ্যাত কবিতা এবং কবির স্বদেশ ভাবনার একটি বলিষ্ঠ প্রকাশ এখানে লক্ষ করা যায়। 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্ বিশ্বাসের কাব্য। তবে তাঁর ভগবদ্ বিশ্বাস কোনো বিশেষ ধর্ম নির্ভর নয়, সংসার বিরাগী কোনো তপস্বীর সাধনা নয়। তাঁর দেবতা কোনো মন্দিরে আবদ্ধ নন, মানুষের সমাজে যারা অধঃপতিত, নির্যাতিত, দরিদ্র, নিঃস্ব, সর্বহারা তাদের মধ্যেই তাঁর ভগবানের আসন পাতা। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তিনি কোনোদিনই কামনা করেননি, সংসারের সহস্র বন্ধনের মাঝেই তিনি মুক্তি সন্ধান করেছেন। আপন দেশেই তিনি তাঁর বিশ্বদেবতাকে উপলব্ধি করেছেন। যে স্বদেশে কবি তাঁর বিশ্বদেবতার প্রতিমূর্তি দেখেছেন, যে স্বদেশ বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র ; সেই স্বদেশ কৃত্রিম

জাতিভেদের দ্বারা, কুসংস্কারের দ্বারা মানুষকে যে অস্পৃশ্য করে রেখেছে তাতে কবি ব্যথিত হয়েছেন। সেই ব্যথা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'গীতাঞ্জলি'র 'অপমানিত' কবিতাটি।

কবি-মনের আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে আলোচন্য কবিতাটি—

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

কবি মনে করেন, মানুষকে ঘৃণা করার প্রতিফল স্বরূপ ভগবানের কাছে একদিন তাকে চরমমূল্য দিতেই হবে—'মানুষের অধিকারে/বঞ্চিত করেছ যারে/সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান/অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' বস্তুত গীতাঞ্জলিতে কবি এই সর্বমানবের ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। সকলের সঙ্গে তাঁর প্রেম লাভ করে তিনি ধন্য হতে চেয়েছেন।

মানবজীবনের একটি বড় অভিশাপ অস্পৃশ্যতা। ছোঁয়াছুঁয়ি, বাচবিচার, ছোট-বড়, উচ্চনীচ—এই ভেদাভেদ মানুষকে ক্রমে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষের মধ্যেই যে তার প্রাণের ভগবান বিরাজ করেন একথা সে বিস্মৃত হয়। ফলে মানুষকে ঘৃণা করে। কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করা মানে সে তার প্রাণের ঠাকুরকেও ঘৃণা করে বসে। এই অপরাধের জন্য একদিন মানুষকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন আসে তখন মানুষের সংসারের সকল বিভেদ ঘুচে যায়, মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়, একই সঙ্গে অন্ন ও জল গ্রহণ করে—এভাবেই তারা এক হয়ে যায়।

আমাদের বৃহৎ ভারতবর্ষে নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষই অধিক। হিসেব করলে দেখা যাবে হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনই সাধারণ মানুষ। সুতরাং তাদের অবহেলা করার অর্থ নিজেদের শক্তিকেই দুর্বল করে ফেলা। দেশের শক্তিকে অবহেলা করে দেশকে শক্তিশালী করা যায় না। দেশের প্রাণ যারা তাদের মধ্যেই নিজের স্থান করে নিতে হবে, পদদলিত, অবহেলিতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তবেই অন্যায়ের হাত থেকে, পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ মিলবে।

দেশের যারা শক্তি, সেইসব দরিদ্র, অসহায় মানুষদের যদি পিছনে ফেলে রাখা হয়, তাহলে তারাও সমাজকে পিছনের দিকেই টানবে। সমগ্র দেশকে যদি একটি মানবদেহ বলে ধরতে হয় তাহলে তার পিছনের অংশকে বাদ দিয়ে সামনের অংশকেই শুধু ধরলে চলবে না। এভাবে কখনোই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ দেহ সমগ্র, এক এবং অখণ্ড। তার কোনো অংশকে বর্জন করা মানে তার সামগ্রিকতা বা অখণ্ডতা নষ্ট হওয়া। পিছনের অংশকে যত দূরে সরিয়ে রাখা হবে ততই তার ভার বৃদ্ধি পাবে, ফলে সামনের অংশকে পিছনের ভারে বারবার পিছিয়ে পড়তে হবে—'যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাধিবে যে নীচে,/পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার প্রভৃতির বন্ধনে সমাজকে আচ্ছন্ন করে রাখলে সমাজের কখনোই উন্নতি হতে পারে না। সকলের মঙ্গালেই সমাজের মঙ্গাল সাধিত হয়—দু'একজনের মঙ্গালে নয়। সে চেষ্টা করলে উভয়ের মধ্যে শুধু ব্যবধানই বেড়ে যায়। ফলে দেশের সার্বিক মঙ্গাল তাতে ব্যাহত হয়, জাতির উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পঞ্চম স্তবকে কবি শতেক শতাব্দী ধরে অবহেলিত হয়ে আসা মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। কবি বলছেন, এই অপমানিত মানুষদের প্রণাম জানাতে হবে, তবেই ঈশ্বরকে প্রণাম জানানো হবে। একথা কবি গীতাঞ্জলির বেশিরভাগ কবিতাতেই বলেছেন। 'দীনের সঙ্গী', 'ধূলা মন্দির', 'ভারততীর্থ' প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবির মতে, ভগবান মন্দির বা মসজিদে থাকেন না, তিনি আছেন দীন পতিতের মাঝখানে, খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে। সুতরাং তাঁকে পেতে গেলে অপমানিতদের মাঝখানে নেমে আসতে হবে।

জাতি অভিমান মানুষকে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে। কবি তাই তার নিন্দা করেছেন। তিনি মৃত্যুকে

স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, যদি এখনও মানুষ তার ভুল না বুঝতে পেরে থাকে তবে তার ভুল ভাঙতে মৃত্যুদূতকেই এগিয়ে আসতে হবে। চিতাভস্মের মধ্য দিয়ে সে প্রমাণ করে দেবে সব মানুষ সমান। জাত, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের একটাই রূপ—সে মানুষ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই একই উপাদানে গঠিত সকল মানুষ।

বস্তুত 'গীতাঞ্জলি'তে কবি এই সর্ব মানবের ভগবানকে কামনা করেছেন। মানবপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ সকলের সঙ্গো তাঁর প্রেম লাভ করে ধন্য হতে চেয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, জগতের দীন-দরিদ্র, রিক্ত-নিঃস্ব মানুষের মধ্যেই ভগবান বিরাজ করেন ; ধনী-মানীর সমাজে তাঁকে পাওয়া যায় না। কবি সেই ভগবানের প্রেম কামনা করে বলেছেন—'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

'অপমানিত' কবিতায় এই কথাই বলেছেন। এই মানবপ্রেমের সঙ্গো কবির স্বদেশপ্রেমও যুক্ত হয়ে গেছে এখানে।

৭.৭.১ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনা সঙ্গো যে বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম যুক্ত হয়েছে 'অপমানিত' কবিতা অবলম্বনে তা দেখান।

২। 'অপমানিত' কবিতা 'গীতাঞ্জলি' কাব্যধারার একটি অন্যতম কবিতা—আলোচনা করুন।

৩। 'রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকেন্দ্রিক নয়, সর্বমানবের মধ্যেই তিনি তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন'—'অপমানিত' কবিতা অবলম্বনে সমালোচকের এই মন্তব্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করুন।

৭.৮ ॥ 'দূর হতে কী শুনিস' ॥ (৩৭ সংখ্যক)

'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'-র অধ্যাত্ম পর্বের পরে 'বলাকা' যেন রবীন্দ্রকাব্যের পালাবদলের সূচনা করল। রবীন্দ্রনাথ আবার প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে ফিরে এলেন। রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে 'বলাকা' একটা গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করে আছে। 'বলাকা' রবীন্দ্র কাব্যে একটা স্বতন্ত্র যুগ সৃষ্টি করল। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যরূপটি এই পর্বে কবির চোখে পড়ল। সৃষ্টি নিরন্তর বেগে ছুটে চলেছে চির-পথিকের ন্যায়। এই গতিই বা অগ্রসর হওয়াই প্রকৃতি ও মানুষের ধর্ম। 'বলাকা'য় কবি দেখলেন নিরন্তর গতির মধ্যেই বিশ্বের প্রাণশক্তি নিহিত। এই গতির প্রতিপদে ধ্বংস এবং মৃত্যুর আবির্ভাব হচ্ছে, আর তার আবির্ভাবই নতুনের সম্ভাবনাকে সূচিত করছে। 'দূর হতে কী শুনিস' 'বলাকা' কাব্যের '৩৭' সংখ্যক কবিতায় তারই আভাস লক্ষিত হয়।

'বলাকার' '৩৭' সংখ্যক কবিতাটি 'ঝড়ের খেয়া' নামে পরিচিত। কবিতাটি প্রথম মহাযুদ্ধে সময় লেখা হয়। এই পর্বে কবি-প্রাণ যথেষ্টই পীড়িত হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে শুধু 'বলাকা'র কবিতায় নয়, ১৯১৪-র বেশ কিছু ভাষণে। এই ভাষণের বক্তব্য এবং 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার পঙ্ক্তিতে হুবহু মিল লক্ষ করা যায়। বস্তুত যখন যুগ সংকট উপস্থিত হয়, কাল আবিল হয়ে ওঠে, তখন ইতিহাস পুরুষের কণ্ঠে নতুন পথে যাত্রার আহ্বান ধ্বনিত হয়। পুরানোর পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্ত অতীতকে ঘুচিয়ে অনাগত ভবিষ্যৎকে বর্তমানের মধ্যে মূর্ত করে তোলার জন্য যুগন্ধর পুরুষ আহ্বান জানান। এই যুগন্ধর পুরুষকে কবি বলেছেন কাণ্ডারী। তারই আহ্বানে অনুগামীরা বেরিয়ে আসে। কবিতায় এই অনুগামীরা হল দাঁড়ি। কাণ্ডারীর দৃষ্টি নিবন্ধ সুদূর ভবিষ্যতে। তার বজ্রমুষ্টিতে ধরা আছে হাল, কারণ তিনিই তরণীর কর্ণধার। কিন্তু তাঁর একার চেষ্টায় শুধু ইতিহাসের তরী গতি পায় না, গতি পায় অনেক দাঁড়ির সমবেত দাঁড় টানায়। ইতিহাসের তরী বর্তমানের বন্দর থেকে যাত্রা করে নতুন সৈকতের

সন্ধানে। এই যাত্রাপথ কন্টকাকীর্ণ। সম্মুখে মৃত্যুর সমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। সমুদ্রের অপর পারে অমৃত। মৃত্যুকে পেরিয়ে সেই অমৃত লাভ করতে হয়। অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে—মানুষের এই যাত্রা চলছে চিরকাল। মানুষের নিজের ভুলে ভরে ওঠে তার বর্তমান, আর তখনই ভুল থেকে বেরিয়ে সত্য লাভের আকুতি জাগে প্রাণে। সেই সত্যসন্ধিৎসা থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার উৎসাহ মানুষকে পেয়ে বসে। আলোচ্য কবিতায় সেই দুঃসাহসিক যাত্রার এক বলিষ্ঠ ছবি আছে।

'বলাকার' 'শঙ্খ' কবিতায় কবি যে ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজার ঘরে শান্তি-স্বর্গ খুঁজতে গিয়েছিলেন, সে শান্তি বেশিক্ষণ মিললো না। তাই কবি পুজোর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এবং 'ঝড়ের খেয়া'-য় লিখলেন—

'দুঃখের দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে।'

দুঃখ-পাপ, অশান্তি-অমঙ্গালের এমন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রবীন্দ্র কবিতায় কখনও আগে চোখে পড়েনি। 'শঙ্খ' কবিতায় মানুষকে আহ্বান জানানোর শঙ্খ ধুলোয় পড়ে আছে দেখে কবি তা হাতে তুলে নিলেন এবং মানুষকে ডাক দিলেন অমঙ্গালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দাঁড়াতে। সেই সংগ্রামের বলিষ্ঠ রূপ আঁকা হয়েছে 'ঝড়ের খেয়ায়'।

'উগ্রজাতি-অভিমান' সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয় যখন একটি জাতি ভাবতে শুরু করে তার পৃথিবী জুড়ে প্রভুত্বে অধিকার আছে, আর সকল জাতি তার দাস, তখন সেই সংকীর্ণ জাতি অভিমান 'মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান' ঘটায়, লোভী জাতি বিশেষের লোভ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে দেখা দেয় 'বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ'। একদিকে প্রবলের অন্যায় নখদন্ত বিস্তার করে, অন্যদিকে 'ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ' মাথা চাড়া দেয়। এভাবেই একদিন য়ুরোপীয় জাতিগুলি নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে এশিয়ায়, আফ্রিকায় প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। প্রভুত্ব বিস্তারে জার্মান যথাসময়ে মন দেয়নি, যখন দিল তখন 'আজ ক্ষুধিত জার্মানীর বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস দুইজাতের মানুষ আছে, প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য যোগাইবে। যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে আর যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।' 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। যে সত্যের বোধে উজ্জ্বল 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধটি, সেই সত্য বোধের চকিত উদ্ভাস আছে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায়।

আলোচ্য কবিতায় পাপের দায় কবি চাপিয়েছেন অত্যাচার-অত্যাচারিত, প্রভু-দাস, বিজেতা-বিজিত নির্বিশেষ সকলে ঘাড়েই। বলেছেন—'ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত/এ আমার এ তোমার পাপ।' এই কথাই তিনি 'ঝড়ের খেয়া' লেখার একবছর আগে শান্তিনিকেতনে ভাষণ মালায় 'পাপের মার্জনা'য় কবি বলেছিলেন। সমগ্র মানবসমাজ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। একের বেদনা যেমন অপরকে সহ্য করতে হয়, একের ফল ভোগও তেমনি অপরকে ভাগ করে নিতে হয়। এইজন্য 'জাতি-অভিমানে' যারা মত্ত হ'ল, তাদের মত্ততার ফলভোগ করতে হয় নিরীহ দাস জাতিকে। বাতাস যখন ভারী হয়ে হাল্কা হতে থাকে, তখন তার প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে না। কিন্তু তারপর হঠাৎ ঝড় ওঠে, শুরু হয় ধ্বংসলীলা। এভাবেই সমাজের কোথাও পাপ জমে উঠলে তার বিষক্রিয়া সমগ্র মানব সমাজকে ভোগ করতে হয়, তাই কবি লিখলেন—'বিধাতার বক্ষে এই তাপ/বহুযুগ হতে জমি বায়ু কোণে আজিকে ঘনায়।' মানুষের পাপে বিধাতার বক্ষে যে তাপ জমেছে তার থেকেই আজ বায়ু কোণে ঝড় উঠেছে। এই পাপ যেমন সকলে, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেও সকলে।

যেখানে ক্রন্দনে আর্তনাদে লক্ষ বক্ষ থেকে রক্তের কল্লোল, যেখানে বহ্নিবন্যা তরঙ্গিত হচ্ছে, যেখানে ঝড়ের মেঘ জমেছে, যেখানে আকাশ আর পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচে গিয়ে শুধুই মরনে মরনে আলিঙ্গান চলেছে—সেখানে তারই মধ্য দিয়ে পথ করে তরী নিয়ে পাড়ি দিতে হবে নতুন সমুদ্রতীরে। সুতরাং এই কবিতায় প্রারম্ভেই আছে অশুভ শক্তির হাতে বিপর্যস্ত জগৎ ও জীবনের ছবি। এরই মধ্যে কাণ্ডারী এসেছেন, তার কণ্ঠে

আদেশ ধ্বনিত হয়েছে—'বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ।' যখনই অতীত ধূসর হয়ে ওঠে, তার সত্যের পুঁজি ফুরায়, তখনই যুগ স্রষ্টার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নবযুগের আহ্বান। এই যুগস্রষ্টাই কাণ্ডারী। তাদের কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন—'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার/খুলিতে বিলম্ব ককত আর।' ইতিহাসের তরী এইভাবে মৃত্যুভেদ করে চলে। কারণ তার গন্তব্য আগামীর পথে। ঝোড়ো রাত্রির অন্ধকারে তাদের মনে দূর প্রভাতের প্রত্যাশা আর 'ঊষার স্বর্ণদ্বারে'র স্বপ্ন আছে বলেই এভাবে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন। তারা জানেন বীরের রক্তস্রোত, জননীর অশ্রু কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। দাঁড়ি তাদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যখন বিকশিত করে তুলবেন, তখন মানুষ হিসাবে তাদের সীমাবদ্ধতা যাবে ঘুচে। এই সীমাবদ্ধতাই কবিতার ভাষায় 'মর্ত্যসীমা' ! একেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মুষ্যত্বের চরম বিকাশ।'

বস্তুত অমৃতের সাধক রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে দেবতার অমর মহিমা লক্ষ করেছিলেন। 'ঝড়ে খেয়া' কবিতার শেষে কল্পনার সেই সত্যরূপ আভাসিত হয়েছে। যদিও কবিতাটির শেষ হয়েছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে, তথাপি কবি মনে কোথাও কোনা সংশয় দেখা দেয়নি। যে আশ্বাসে কালের যাত্রীরা চলেছেন তা স্থির এবং নিষ্কম্প। তারা জানেন এবং বিশ্বাস করেন রাত্রির তপস্যা দিন আনবেই। রক্তপাত, দুঃখ, আঘাতের বিনিময়ে এরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবেন। সেখানে মানুষ তার জীবনধর্ম অতিক্রম করে যথার্থ মানবধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৭.৮.১ অনুশীলনী

১। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি 'বলাকা'র প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা—আলোচনা করুন।

২। বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় কবি যে সত্যকে বাণীরূপ দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। 'বলাকা' গতিরাগের কাব্য, সেই গতিতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে '৩৭' সংখ্যক কবিতাটি আলোচনা করুন।

৭.৯ মুক্তি

'পলাতকা' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'মুক্তি'। 'বলাকা'র পর 'পলাতকা'-য় এসে যেন কবি-প্রাণের বিশ্রাম ঘটল। কবি মাটির মানুষের কাছাকাছি এলেন, তাদের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেললেন। 'বলাকা'য় যে গতিবেগের কথা আছে তার বৃহৎ পরিণাম হ'ল মুক্তি। বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে জীবনের সার্থকতা নেই, সুদূরের বাঁশি সর্বদাই আমাদের ঘর-ছাড়ার আহ্বান জানাচ্ছে, এক বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে দাঁড় করাবার জন্য। 'মুক্তি' কবিতায় সেকথাই বাণীরূপ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রমথ বিশীর উক্তিটি স্মরণযোগ্য—

'রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনা ব্যক্তির বন্ধন মোচনের আহ্বানে পূর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন জরা, জড়তা, অভ্যাস, সংস্কার, একান্তবর্তী প্রথা—বন্ধনের আর অন্ত নাই, সমস্তই ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ব্যক্তিকে individual কে পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে তিনি বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। এই আহ্বানের একপ্রান্তে মুক্তি নামে কবিতাটি ; হালদার গোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর প্রভৃতি অন্য প্রান্তে...পলাতকা কাব্যের নারী নায়িকার দল মাতৃত্ব-প্রেয়সীত্ব-পত্নীত্বের ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া এক সময়ে বিশুদ্ধ নারীত্বে আসিয়া উপনীত হয়—তখন বুঝিতে পারে 'আমি নারী, আমি মহিয়সী।' (রবীন্দ্র সরণী)

পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত 'মুক্তি' কবিতাটি। মধ্যবিত্ত বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারে বধূরা যে অন্ধকারময়, বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দ জীবনযাপন করে, তার মধ্যে যে দুঃখ-বেদনা ও নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা কবি তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন আলোচ্য কবিতায়। স্বামীগৃহে প্রবেশ করে বৃহত্তর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বধূটি সংসারের

অন্তঃপুরের কারাগারে বন্দিনী জীবনযাপন করে চলেছে বাইশ বছর ধরে। ন'বছরের মেয়ে 'দশের-ইচ্ছা-বোঝাই করা' জীবনটাকে বাইশ বছর ধরে টেনে টেনে আজ পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কর্মের চাকা অক্লান্ত ভাবে বয়ে গেছে, এই সংকীর্ণ পরিবেশের বাইরে যে একটা বৃহৎ বিশ্ব তার অপার সৌন্দর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে তা তার অগোচরেই রয়ে গেছে। নিজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাও তার কাছে ছিল অজ্ঞাত। সে শুধু জানত—'রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা। তারপর একদিন তাকে ধরল এক সাংঘাতিক রোগে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে জানালা দিয়ে এই প্রথম সে বিশ্ব প্রকৃতির স্পর্শ অনুভব করল। এক অনির্বচনীয় মুক্তির আনন্দে তার দেহ মন পূর্ণ হল। সেইদিন সে প্রথম নিজের অন্তরের সত্তাটির পরিচয় পেল—

'প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানালা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে
আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।'

দীর্ঘকালের অসুস্থতা বধূটির চোখের সামনে থেকে সংস্কারের জড়তা ও অভ্যাসের পর্দাগুলি সরে গিয়ে তাকে যেমন দিব্যদৃষ্টির অধিকারী করে তুলেছে। সে বুঝতে পারছে, বসন্ত কাল বাইশ বছর ধরেই তার মনের আঙিনায় দোলা লাগিয়েছিল—আহ্বান জানিয়েছিল জলে-স্থলে সর্বত্র। কিন্তু সে তাতে সাড়া দেয়নি। আসলে গৃহকর্মে সদাব্যস্ত বধূটির পক্ষে জানাই সম্ভব হয়নি, কখন বসন্ত কাল এলো আর গেলো। আজ সে উপলব্ধি করছে, বসন্ত হয়তো এসে তার মনে সাড়া জাগাতো। কিন্তু সচেতন ভাবে সেকথা সে বুঝতে চাইতো না, সন্ধ্যাবেলায় তার স্বামী আসত আপিস থেকে, তারপর পাড়ায় যেত পাশা খেলতে। সেদিনের সেই বঞ্চিত জীবনের কথা আজ সহসা মনে পড়ে যাচ্ছে ক্ষণিক ব্যাকুলতায়।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ বধূটি বাইশ বছর পর তার জীবনে বসন্ত এসেছে তা অনুভব করছে। বস্তুত আসন্ন মৃত্যু তার জীবনে চিরন্তন মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে দেখা দিল। মরণ তার কাছে আজ পরম প্রিয়তম, সেই তাকে আজ বাসর ঘরে আহ্বান জানিয়েছে, তাকে অমৃতরসের সন্ধান দেবে বলে—

'এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধূলায় পড়ে যাক।
মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু—
হেলা আমায় করবে না সে কভু।'

বন্ধন মানুষকে জীবনের প্রকৃত আনন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি দেয় না। জীবনে তাই প্রয়োজন হয় মুক্তির, সেই মুক্তিই মানুষকে বৃহৎ বিশ্বে ছড়িয়ে জীবনের সার্থকতা আনয়ন করে। মৃত্যু সেই অনন্ত মুক্তির দূত। সে শুধু জীবনের বন্ধনকেই ভাঙে না, সমগ্র জীবনের বদ্ধ অবস্থাকে ভেঙে মুক্তির আনন্দ এবং নতুন জীবনের আস্বাদ আনে। মৃত্যু কারও ওপর প্রভুত্ব করে না, সে ভালোবেসে সকলকে গ্রহণ করে, কারুর প্রতি তার কোনো অবহেলা নেই। সেই অন্তর্যামী, মানুষের মাঝে যে সুধারস আছে তাকেই প্রার্থনা করে সে। বধূটির মাঝে যে সুধারস আছে তাকেই সে প্রার্থনা করেছে। তার সেই চেয়ে দেখার আলোকে বধূটি নতুন করে আপনাকে আবিষ্কার করল এবং বলে উঠল—

‘মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী।
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার’।

এইভাবে সে তার ব্যর্থ বাইশ বছরের জীবন থেকে মুক্তি কামনা করেছে। আর সেই মুক্তির দূত হয়ে এসেছে মৃত্যু।

৭.৯.১ অনুশীলনী

১। ‘মুক্তি’ কবিতাটি ‘পলাতকা’ কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা—আলোচনা করুন।

২। ‘মুক্তি’ কবিতায় কার মুক্তির কথা বলা হয়েছে ? সেই মুক্তির স্বরূপটি পরিস্ফুট করুন।

৩। ‘মুক্তি’ কবিতাটি ব্যর্থ নারী জীবনের এক করুণ রাগিণী’—সমালোচকের মন্তব্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করুন।

৭.১০ তপোভঙ্গা

‘পূরবী’র এক অসামান্য কবিতা ‘তপোভঙ্গা’। ‘পূরবী’ রবীন্দ্রনাথের পরিণত পর্বের কাব্য। এই পর্বে কবি মাটিমায়ের প্রতি, তৃণ-তরুলতার প্রতি জল-হাওয়ার প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত হয়েছেন। জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছিয়ে কবি একবার তাঁর ফেলে আসা জীবনের প্রতি, এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতি, আতুর হয়েছেন, এবং দুর্লভ সেই স্মৃতিগুলিকে বুকে আঁকড়ে রাখতে চাইছেন। জীবনের এই শেষবেলায় এসে কবি ‘কান্না-হাসির-গঙ্গা-যমুনায়’ ভাসতে চেয়েছেন। বিদায়ের করুণ রাগিণী ধ্বনিত হতে শুরু করেছে, নতুন করে জীবন-উপভোগ করবেন সে সম্ভাবনাও নেই। পরপারের ডাক এসেছে, কিন্তু একজন রোমান্টিক অনুভূতি প্রবণ কবির পক্ষে পৃথিবীর সঙ্গো সব সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব নয়। বরং ধরণি থেকে বিদায়ের পূর্বে কবি আবার নতুন করে তার সঙ্গো সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা পড়তে চান—এই মূল ভাবটিই ‘পূরবী’ কাব্যে ধরা পড়েছে। চিরতারুণ্যের পূজারি কবি তাই যৌবনের সেই সৌন্দর্যময় দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য মহাকালের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ‘তপোভঙ্গা’ কবিতায়।

‘পূরবী’র ‘তপোভঙ্গা’ কবিতায় বৃদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের ‘কুমার সম্ভব’ স্মরণে রেখে উপস্থিত হতে চেয়েছেন প্রেম-সৌন্দর্যের অমরাবতীতে। প্রেম হল মৃত্যুঞ্জয়, কামনার অগ্নিগর্ভ বহিঃপ্রকাশ পরাভূত হয় তার কাছে। কবির কাজই তো চিরবসন্ত, চির যৌবনের লীলাকে অব্যাহত রাখা। যৌবনের আনন্দের সুধাপাত্র কখনোই রিক্ত হতে পারে না। সেই চিরন্তন অথচ বিস্মৃত যৌবনের দিনগুলির জন্য কবি কালের অধীশ্বর মহাদেব সর্বভোলা, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হয়েছেন। কবি প্রশ্ন করেছেন, তার যৌবন ‘বেদনা রসে উচ্ছল’ ‘দিনগুলি কি তিনি ভুলে গেছেন ? কবি তাঁর জীবনের সঙ্গো সঙ্গো প্রকৃতির মধ্যেও দেখেছেন কিংশুক মঞ্জরীর ঝরে পড়াকে। ‘স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়’ ‘আশ্বিনের শীর্ণশুভ্র মেঘের মত’ সেই জ্বলন্ত যৌবনস্মৃতি কি অন্তর্হিত হয়েছে ? অথচ একদিন কবির এই উদ্দাম যৌবনের দিনগুলি তাঁর রুক্ষ, রিক্ত, সন্ন্যাসীবেশকে দূর করে তাঁকে অপূর্ব সৌন্দর্য সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল। ভোলানাথের ডম্বরু-শিক্ষা কেড়ে নিয়ে হাতে তুলে দিয়েছিল মন্দিরা, বাঁশি এবং তার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে দিয়েছিল বসন্তের গীত-রসে।

ভোলানাথ-শিবের তপস্যায় শুষ্কতা ও রিক্ততা সেদিন কোথায় ভেসে গেল শূন্যে, তাঁর ধ্যানের নিগূঢ় আনন্দ মন্ত্রটি বাইরে এসে ধরণিকে পুষ্প সম্ভারে এবং নব কিশলয়ে পূর্ণ করল। বসন্তের আবির্ভাবে সন্ন্যাসের হল অবসান। ভোলানাথ আপন অন্তরে এই সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে ‘বিশ্বের ক্ষুধার’ ‘সুধার

পাত্রটি' পান করলেন। শুরু হল মহেশ্বরের উদ্দাম নৃত্য। সেই অপূর্ব নৃত্যের নব নব রূপ ও নব নব সৌন্দর্যের লীলা দেখে কবি আত্মহারা হয়ে সেই নৃত্যের ছন্দে ও তালে কবি কত গান রচনা করলেন। কিন্তু আজ সেই সুধার পানপাত্র কি ক্ষ্যাপার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ? কবির সেই যৌবনের উচ্ছল দিনগুলি কি 'নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিঃশ্বাসে' রিক্ততার বেদনায় ম্লান হয়ে গেল ? কবির বিশ্বাস সেই দিনগুলি কখনোই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মহেশ্বর সেই চঞ্চল আনন্দোচ্ছল দিনগুলিকে নিজের মধ্যে সংগোপনে রেখেছেন, সেই উদ্দাম ও প্রাচুর্যকে তপস্যার দ্বারা শান্ত করে রেখে লীলাচ্ছলে সেজেছেন। কবি নিশ্চিত জানেন, এই তপস্যার নিস্তব্ধতা ভাঙবে, আবার যৌবনের দিনগুলো ফিরে আসবে—

'জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছাসে।'

কবি করবেন মহেশ্বরের তপস্যাভঙ্গ। তাঁর প্রধান কাজই হল রিক্ততা ও শুষ্কতাকে দূর করে নতুন রূপ, রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, আনন্দের উদ্দাম প্রবাহে জীবনকে প্লাবিত করা, বেদনার সঙ্গীতে ধরণিকে আনন্দে শিহরিত করা—

'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।'

বাইরের এই রিক্ততা ও শুষ্কতা ভোলা মহেশ্বরের ছদ্মবেশ ; কবি সন্ন্যাসীর ছলনা বুঝাতে পেরেছেন। তিনি বিচ্ছেদের দুঃখদাহে উমাকে কাঁদিয়ে মিলনের আনন্দকে নিবিড় ও তীব্র করার জন্য এই ছল অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর প্রিয়া-মিলনের বিচিত্র ছবি এঁকেছেন কবি। তিনি মিলনের পরমলগ্নে শ্মশান-বৈরাগীর বেশ পরিবর্তন করে তাঁকে পুষ্পমাল্যে, পট্টবস্ত্রে সজ্জিত করেছেন। কবি চির-তরুণ, যৌবনের সম্ভারে, তাঁর নিত্য অধিকার, ধরণির সৌন্দর্য-মাধুর্যের চিরন্তন উপাসক।

'তপোভঙ্গ' কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে তার মূলভাবের ভিতর থেকে তিনটি উপাদানের সাক্ষাৎ মেলে—

১। জীবন সায়াহ্নে উপনীত কবির এতদিনকার ধরণির রূপ-রস-গন্ধস্পর্শাত্মক উপলব্ধি, মানবজীবনের প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যের তীব্র অনুভূতি ক্ষীয়মান হয়ে পড়েছে, কবির এতদিনকার কাব্যরচনাও স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু কবি তো চিরতরুণ, তাঁর উৎসাহ তো শেষ হবার নয়। তাই যৌবনবেগে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য কবিতাটি কবির সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—আপনার-কবি-সত্তাকে পুনর্জাগরণের প্রয়াস।

২। কবি তাঁর এই মূল ভাবটিকে প্রকাশ করার জন্য কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর শিবের তপোভঙ্গের বিষয়টিকে একটি রূপকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। কালিদাসের শিব কল্পনার সঙ্গে নটরাজ শিবের কল্পনা মিশ্রিত হয়ে আছে। নটরাজ বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নৃত্যরত—তাঁর এক পদপাতে ধ্বংস, অন্য পদক্ষেপে সৃষ্টি। তাঁর কাজই হচ্ছে ধ্বংস-সৃষ্টি-শূন্যতা-ঐশ্বর্য নিয়ে লীলা করা। কবির বিশ্বেশ্বরের এই নটরাজমূর্তি—লীলারসে মত্ত হয়ে একবার ভাঙছেন ও একবার গড়ছেন।

৩। বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রাণপ্রবাহের একটা লীলা চলছে—সেখানেও যেন একটা নৃত্যের আবর্ত। ধূসর বসন বৈশাখের পরে আসে সজল-শ্যামল মেঘমালা বর্ষণ ; সন্ন্যাসী বৈশাখের সঙ্গো শ্যামলী প্রিয়া বর্ষার মিলন সাধিত হয়। তারপর মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সোনালি আলোর স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন বিলীন হয় হেমন্তের ধূসর ঘোমটার আড়ালে, পরিশেষে শীতের উত্তর-সমীরণে জীর্ণ পাতার শ্মশান শয্যা—আবার বসন্তের নতুন হিল্লোল, গাছে গাছে নবপত্রপুষ্পের সম্ভার।

চৌদ্দটি স্তবকে বিন্যস্ত ‘তপোভঙ্গ’ কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে যে তিনটি উপাদানের সাক্ষাৎ মিলল, তাঁর প্রিয় পৌরাণিক কাহিনি (পার্বতী-পরমেশ্বর) অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ সেই সমস্ত উপাদানের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এমনভাবে বিন্যাস করেছেন যে, কবি, যিনি মূলত স্রষ্টা তিনি একসময় পরিণত হলেন বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি সহচরে। শুধু সৃষ্টি সহচর নন, স্থবিরতার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারী। ভোলা মহেশ্বরকে তিনি সজাগ করেন, পরিণত করেন স্রষ্টাতে। কবি সেই মহেন্দ্রের দূত, যিনি উদাসীনকে করেন জীবনরসিক, স্থবিরতার মধ্যে সঞ্চার করেন প্রাণ। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর জীবনের এই উপলব্ধিকে উজ্জ্বল বাণী মূর্তি দিয়েছেন পৌরাণিক কাহিনির আশ্রয়ে।

‘যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি’...হে ভোলা সন্ন্যাসী’—প্রথম স্তবকের এই প্রথম তিনটি চরণে একটা স্পষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কবি। প্রশ্নটি কবি করেছেন সেই ‘ভোলা সন্ন্যাসী’কে যাঁর কোপানলে দগ্ধ হয়েছিলেন কামদেব মদন। এই জিজ্ঞাসাই আবার ধ্বনিত হল স্তবকের দ্বিতীয় ভাগে। চৈত্রের অবসানের সঙ্গো সঙ্গো সেই দিনগুলি কি ভেসে গেল অকূল পাথারে ? চৈত্র মানে শেষ বসন্ত। বসন্ত যৌবনের কাল, সেই যৌবনকেই তো কবি পুনরায় ফিরে পেতে চাইছেন আপন জীবনে।

তপোভঙ্গোর দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্তবকে আছে কীভাবে একদিন বসন্তের বন্যা স্রোতে সন্ন্যাসের হয়েছিল অবসান। তপোভঙ্গোর প্রথম স্তবকে কবি মহেশ্বরকে বলেছেন ‘ভোলা সন্ন্যাসী’। ‘পূরবী’র পূর্ববর্তী কাব্যের নাম ‘শিশু ভোলানাথ’। কবি ‘শিশু ভোলানাথে’র শিশু হতে চেয়েছেন। শিশু ভোলানাথের অব্যবহতি দিনগুলি কেটেছে কাব্যলোক থেকে অনেক দূরে। বলা বাহুল্য শিশু ভোলানাথ এবং তার সহচর বয়ঃধর্মে নয়, মনোধর্মে শিশু। এই শিশুর জগৎ কাজ ভোলানোর জগৎ, খেলার জগৎ। এই খেলার জগৎই যৌবনের যোগে হয় প্রেমের জগৎ। আর এই প্রেমের সূত্রেই কবি-শিষ্যের সঙ্গো তাঁর প্রেমময় দেবতার সাজুয্য ঘটে। দ্বিতীয় স্তবকের অন্তিমভাগে সুন্দর বেশে সন্ন্যাসীর রূপান্তর সম্ভব হয়েছে বসন্তের ‘উন্মাদন রসে’। জয় হয়েছে ঋতুরাজ বসন্তের। কালিদাসের ‘কুমার সম্ভবম্’-এর ঐতিহ্য এখানে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। উমাপ্রেমেই কালিদাসের মহেশ্বরের নবনব ঐশ্বর্যের প্রকাশ। পঞ্চম স্তবকে সন্ন্যাসীর এই রূপান্তর কবির দৃষ্টিতে অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত। কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে কবির সংশায়াত্মক জিজ্ঞাসা এবং তার সদর্থক উত্তর। ষষ্ঠ স্তবকের শুরুতে ছিল প্রশ্ন—‘সেদিনের পান পাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা ?’ সপ্তম স্তবক শুরু হল এই ঘোষণা দিয়ে—‘নহে নহে আছে তারা’। এই ধ্যান সন্ন্যাসীর ধ্যান, নিঃশব্দের নামে সংগোপনে সংহরণ, আবার সম্বরণও বটে। কালিদাসের ‘কুমার সম্ভবে’র তপস্যা প্রেমেরই তপস্যা। এই প্রেমের ধ্রুবমন্ত্র হল ‘নাহিরে, নাহিরে’।

অষ্টম স্তবক শুরু হয়েছে একটি অভিনব রূপকল্পের আশ্রয়ে। কবিতাটির দ্বিতীয়ার্ধের শুরু হয়েছে এখান থেকেই। কালের অধীশ্বর হয়েছেন ‘কালের রাখাল’। এই রূপকল্পের প্রথম সন্ধান মেলে ‘গীতিমাল্যে’র ১০৩ সংখ্যক গানে। সেখানকার রাখাল আলোর রাখাল। ‘তপোভঙ্গ’ কবিতার রাখার ‘কালের রাখাল’। তিনি শিঙা বাজিয়ে ধেণুকে গোষ্ঠে ফিরিয়ে আনেন। অষ্টম স্তবকের দ্বিতীয়ভাগে আছে যুগান্তের কথা, এই যুগান্ত বা কল্পান্ত রচনা করে সৃষ্টির ভূমিকা। অষ্টম স্তবকে শান্ত হয়ে আসা মুহূর্তগুলির পর নবম স্তবকে হয়েছে চঞ্চলের বন্যাস্রোত। চঞ্চলের নৃত্যস্রোতকেই কবি চতুর্থ স্তবকে বলেছেন ‘বসন্তের বন্যাস্রোত’। বসন্তের বন্যাস্রোতেই

তপস্যার অবসান। এই তপোভঙ্গের ফলে যৌবনেরই পুনরুজ্জীবন। এই যৌবন শাশ্বত যৌবন, সে বয়সের জানে বন্দি নয়। দশম স্তবক থেকে উমা মহেশ্বরের চির পুরাতন বিরহলীলার সঙ্গে কবির একাত্মতা ঘটেছে। এ একাত্মতা কবির ব্যক্তিসত্তার নয়, কবি সত্তার একাত্মতা। একাদশ স্তবকে বল্কলধারী বৈরাগীর তপস্যাকে বলেছেন 'ছলনা' ; বলেছেন তপস্যার 'ছদ্মরণ বেশে' তিনি সুন্দরের হাতে একান্ত পরাভব কামনা করেছেন। তপোভঙ্গের কবি তপস্যাভঙ্গের পর মিলনের বিচিত্র ছবি দেখে 'বীণা যন্ত্রে বাজিয়েছিলেন ভৈরবী'। তপোভঙ্গের শেষে কবিচিত্তে শোনা গেল বংশীধ্বনি। বলা বাহুল্য বংশীধ্বনিতে প্রেমেরই জয়ধ্বনি ঘোষিত হল।

বস্তুত চোদ্দোটি বিন্যস্ত 'তপোভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বন্দনা করলেন যৌবনকে। যৌবনের এক পিঠে ভোগ, অন্যপিঠে ত্যাগ। সন্ন্যাসহীন ভোগ মহেশ্বরের তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে দগ্ধ। 'তপোভঙ্গ' কবিতায় আছে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের রূপ, যে-প্রেম-ভস্ম অপমান শয্যা ত্যাগ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে চিরন্তন সত্যরূপে। শৈবকালিদাসের পন্থানুসারী রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় শৈবপ্রেমাদর্শের রূপ চিত্রায়িত করেছেন।

৭.১০.১ অনুশীলনী

১। 'তপোভঙ্গ' কবিতায় রূপকের আড়ালে যে জীবন সত্য ঘোষিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

২। 'তপোভঙ্গ' কবিতায় শৈব কালিদাসের আদর্শ গ্রহণ করে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে প্রেমের জয়ধ্বনি ঘোষিত হতে শুনলেন তা দেখান।

৩। 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করুন।

৭.১১ সবলা

'মহুয়া' কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা 'সবলা'। 'মহুয়া' মূলত প্রেমের কাব্য। তবে এখানে কবি প্রেমকে এক মহীয়সী শক্তিরূপে অনুভব করেছেন। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ভাবিত ছিলেন। ১৯২৮ সালে 'মহুয়ার' 'সবলা' কবিতাটি যখন কবি লেখেন তখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং 'শেষের কবিতার' প্রকাশ শুরু হয়েছে। মোটকথা কবিতায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নারী ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা ঘোষণার কাল এটা। এর দু'বছর আগে ১৯২৬-এ রবীন্দ্রনাথ নরওয়ে ভ্রমণ করেন। 'মহুয়া' রচনার কিছু আগে ও পরে রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীর প্রেম, মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রচার নানা ভাবে শুরু হয়েছিল। 'সবলা' কবিতায় তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। 'চিত্রাঙ্গদা'য় আপন স্বরূপে উদ্ভাসিতা চিত্রাঙ্গদাকে বলতে শুনেছিলাম 'আমি চিত্রাঙ্গদা। দেবী নহি, নহি আইম সামান্য রমণী'। ঠিক এই কথাই বলতে শুলনাম 'পলাতকা'য়—'আমি নারী আমি মহীয়সী'। এই বাণীই ঘোষিত হয়েছিল ১৩০৮-এ 'নষ্টনীড়' এবং ১৩২১ লেখা 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে। 'পয়লা নম্বরে'র অনিলা কিংবা 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনীর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল তার স্বামীকে যে পত্র লিখেছিল তা শুধু স্বামীকে লেখা নয়, সমগ্র পুরুষ সমাজের কাছে লেখা নারীর অভিযোগ পত্র। অনুরূপ মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার নিয়ে সকল নারীর পক্ষ নিয়ে লেখা এক মানবীর দৃপ্ত জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছে 'সবলা'র এই ছত্র কয়টিতে—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?

কবিতাটির সূচনা হয়েছে এই প্রশ্নচিহ্নের সাহায্যে। এই জিজ্ঞাসা সবলার হয়ে স্বয়ং কবি উত্থাপন করেছেন সমাজে নারী জাতির প্রকৃত মূল্য নিরূপণকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকে নারী ছিল শিক্ষার আলো বঞ্চিতা নানা সামাজিক প্রথার শিকার। কিন্তু বিশ শতকে নারী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা এবং সমাজের নানা সংস্কার থেকে মুক্ত। এই সময় থেকেই নারীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটতে থাকে। 'সবলা'য় সেই নারী ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এ নারী আর দৈবের ভরসায় শূন্যের পানে চেয়ে থাকে না। আপন সার্থকতা সে আপনি খুঁজে নেয়। অন্তঃপুরের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে সে স্বয়ং অভিযানে বের হয়। প্রাণকে পণ করে দুর্গমের সাধনা করতে, দুর্গমকে জয় করতে চায় সে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর একমাত্র পরিচয় বধূ হিসেবে এবং সন্তানের জননী হওয়ার মধ্যেই তার জীবনের চরম সার্থকতা। কিন্তু 'সবলা'র নারী এই জীবনকে স্বীকার করতে বাধ্য নয়। সে প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছে বধূবেশে কিঙ্কিনী বাজিয়ে বাসরকক্ষে প্রবেশ করবে না। কারণ, তার দৃপ্ত ঘোষণা—'যে নারী নির্বাক ধৈর্যে চির মর্মব্যথা/নিশীথ নয়নজলে কররে পালন/দিবালোক ঢেকে রাখে ম্লান হাসি তলে/আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি'। আত্মজাগ্রতা এই নারী পুরুষের প্রেমের বীর্যে বীর্যবর্তী হয়ে তার কণ্ঠলগ্না হতে চায়। সবলা নারী বিশ্বাস করে বীরের সঙ্গে তার মিলনের দিন একদিন আসবেই। তবে সে মিলনের লগ্ন হয়তো গোধূলীর ম্লান আলোতে নয়, বীর্যবান প্রেমের খরদীপ্তির কথা প্রেমিককে সে কোনোভাবেই ভুলতে দেবে না। তার এ কঠিন শপথ তাকে জানিয়ে দিতে হবে। তাই নম্র দীনতা তার যোগ্য আচরণ নয়—তা সম্মানের যোগ্যও নয়। আজ থেকে সবলা তাই লজ্জার দুর্বলতাকে দূরে সরিয়ে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে প্রত্যয়ী হতে চায়।

বীর্যবান প্রেমিক ও বীর্যবর্তী প্রেমিকার মিলনের স্থান-কালটিও অসাধারণ। তাদের সাক্ষাৎ বাসর ঘরে নিশ্চিন্ত নিরালায় বসে হবে না, হবে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, সংঘাতময় সংসার তীরে, এ মিলনে সানাই বাজবে না, সমুদ্রের তরঙ্গের গর্জনই বিজয়ের ধ্বনিতে তাদের মিলনের সুর হয়ে রনিত হবে। সেই বীর বর বধূর মিলন গাথা চারিদিকে ধ্বনিত হবে। সবলা নারীর মাথায় থাকবে না অবগুণ্ঠন, তার কণ্ঠে উচ্চারিত হবে—'মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি।' সমুদ্রের পাখির যানায় যখন পশ্চিম দিকের হাওয়া হুংকার তুলবে তখন তারা তাদের যাত্রা পথের দিশা খুঁজে পাবে।

কবিতার সর্বশেষ স্তবকে সবলা নারী পুনরায় ভাগ্যবিধাতাকে সম্বোধন করে আপনার মধ্যে শক্তির জাগরণ কামনা করেছে, প্রার্থনা জানিয়েছে প্রয়োজনে সে যেন বাক্হীন না হয়ে যায়, তার ধমনিতে যে জাগরণ সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে তাকে যেন সে বাইরে প্রকাশ করতে পারে। নারীজীবনের চরম সার্থকতা লাভের মুহূর্তে সে যেন তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গান গাইতে পারে। তার ভিতরে যা কিছু অনির্বচনীয়তা আছে তা যেন সে উজাড় করে নিতে পারে প্রিয়জনের চরণে। নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করার মধ্যেই তার জীবনের চরম সার্থকতা। জীবনে এই সার্থকতা লাভের পর প্রেমের এই নির্ঝরিণী যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তাতেও আক্ষেপের কিছু নেই, কারণ জীবনে চরম উপলব্ধির পর কারুর মনেই কোনো ক্ষোভ থাকে না।

'সবলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর এক পরিপূর্ণ রূপ অঙ্কন করেছেন। প্রথমে যে বিদ্রোহিনী ছিল, কবিতার শেষে সে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত পূর্ণ নারীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা।

৭.১১.১ অনুশীলনী

১। 'সবলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে নারীর মহীয়সী রূপ অঙ্কন করেছেন—তা দেখান।

২। 'মাতা বা গৃহিণীর বিশেষ মোড়কেই তাদের (নারীর) পরিচয়' নয়—মনুষ্যত্বের স্বাতন্ত্র্যেও তারা পরিচিত—আলোচনা করুন।

৭.১২ সাধারণ মেয়ে

‘পুনশ্চ’ কাব্য রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে বেড়াভাঙা স্ত্রী স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন এক অভিনব আঙ্গিকের। কাব্যকে জীবননিষ্ঠ করে তুলতে তার ভাষা ও ছন্দকেও তিনি অভিনবত্ব দান করলেন—‘অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।’ ‘পুনশ্চে’র বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা কবিতাগুলি মনে রাখলে কবির একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ‘সাধারণ মেয়ে’ ‘পুনশ্চ’ কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা। গদ্যছন্দের আশ্রয়ে কবি একটি অতি সাধারণ মেয়ের জীবনকথা বর্ণনা করেছেন। যা সাধারণ, যা তুচ্ছ, যা অসুন্দর তাকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যবিষয়ের বাইরে রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ক্রমে পৃথিবীর পট পরিবর্তন হতে থাকল। বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক হানাহানি, অত্যাচার, অবিচার মাথা চাড়া দিতে লাগল। এ অবস্থায় কবিচিত্তে বন্ধন মোচনের একটু জরুরি তাগিদ এসে পড়ল। ‘পুনশ্চ’ এই নতুন জীবন দর্শন নিয়ে দেখা দিল। নিপাট গদ্যে সাধারণ জীবনের কাহিনি নিয়ে লেখা হল কবিতা। এই প্রসঙ্গে ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতাটি স্মরণীয়।

‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতার সাধারণ মেয়ে মালতী অতি সাধারণ—তার না আছে রূপের জৌলুস, না আছে আভিজাত্যের অহংকার। থাকার মধ্যে আছে তার অসামান্য দুটি ডাগর চোখ। যখন তার বয়স অল্প ছিল, তখন একজনের মন ছুঁয়েছিল তাঁর কাঁচা বয়সের মায়া। তার জীবনের এই রোমান্টিক প্রেমকাহিনিকে বাস্তবের রঙে রাঙিয়ে কবি গদ্যছন্দের আশ্রয়ে অসামান্য মহিমা দিয়েছেন। বাংলাদেশে তার মতো এমন অনেক সাধারণ ঘরের মেয়ে আছে যারা পুরুষের স্তুতিতে খুশি হয়ে আত্মসমর্পণ করে বসে পুরুষের কাছে, বিকিয়ে যায় সামান্য দামে। তারপর প্রত্যাখ্যাতা হয়ে চোখের জলে দিনযাপন করে।

সেই সাধারণ মেয়ে মালতী শরৎচন্দ্রের ‘বাসিফুলের মালা’ গল্পটি পড়ে নায়িকার জলে উৎসাহিত হয়ে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছে তাকে নিয়ে আর একটি গল্প লেখার জন্য। শুধু অনুরোধ নয়, সে শরৎচন্দ্রকে পরামর্শও দিয়েছ কেমন করে সেই সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। গল্পের শুরুতে তার জীবনের দুঃখের বর্ণনা থাকবে—নরেশ নামের এক যুবকের সঙ্গে যে মালতীর প্রেমের সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশে, তার করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে বিলাত প্রবাসী নরেশের প্রত্যাখ্যানে। বিলেতে গিয়ে নরেশ আবিষ্কার করে সেখানকার বুদ্ধিশালিনী, রূপবতী, বিত্তমান মহিলাদের। তাদের মধ্য থেকেই লিজা নামের মেয়েটির সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক সংবাদপত্র মারফত মালতী জানতে পারে—সে তার সামান্য বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারে তার কপাল পুড়েছে। নরেশের চিঠিতে লিজির যে অসামান্য প্রশংসার কথা আছে তা পড়ে মালতী বুঝতে পেরেছে একটা অদৃশ্য খোঁচা আছে তার প্রতি, তা থেকেই সে তার পরাজয়ের কথা বুঝে নিয়েছে। জীবনে হেরে যাওয়া এই মেয়েটি দরদি শিল্পী শরৎ বাবুর লেখা গল্পে জয়ের মালাটি জিতে নিতে চায়।

প্রাচীন কালের কবিরা ত্যাগের মধ্য দিয়ে দুঃখের মহিমা প্রদর্শন করে তাদের নায়িকাদের জয়ী করেছেন। যেমন কালিদাসের শকুন্তলার কাহিনিতে লক্ষ করা যায়। বিধাতা কৃপণ বলে সাধারণ মেয়েদের সৃষ্টিতে বেশি সময়টুকুও দেন না। তাই মেয়েটি বিধাতার কাছে নয়, মানুষের দরবারে নালিশ জানায় সকল উপেক্ষিতা সাধারণ নারী হয়ে। লেখকের বলিষ্ঠ লেখনী স্পর্শে সে যেন অসামান্যা ও সম্পূর্ণা হয়ে উঠতে পারে, তার স্বপ্ন যেন কবির কল্পনার স্পর্শে সফল হয়ে ওঠে। নরেশ যেন সাতবছর ধরে অকৃতকার্য হয়ে আটকে থাকে—আর মালতী ইতিমধ্যে এম. এ. পাশ করুক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, লেখকের একটা কলমের আঁচড়ে সে যেন গণিতে প্রথম হয়। শুধু এখানে থামলেই চলবে না, কথা সাহিত্যিকের সাহিত্য সম্রাট নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে হবে। মালতীকে সর্বগুণে গুণান্বিত করে বিদেশে জ্ঞানী, গুণী, কবি, শিল্পী, রাজা-রাজড়াদের আসরে বিদুষী রূপে

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মালতীর সম্মানে যেন একটা সভা ডাকা হয়, যে সভায় নরেশের সামনে মুষলধারে বর্ষিত হবে চাটুবাক্য। তাহলেই সার্থক হবে মালতীর স্বপ্ন। তারপরে! তারপরে 'নটে শাকটি মুড়োল/স্বপ্ন আমার ফুরোল।/হায়রে সামান্য মেয়ে,/হায়রে বিধারাতর শক্তির অপব্যয়'।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই সাধারণ মেয়ে কোনো অংশেই সাধারণ নয়, সে অসাধারণ এবং অসামান্যা। সাধারণ মেয়ের প্রতি কবি তাঁর অন্তরের গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং সেই সঙ্গে দরদি শিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রতি অগ্রজ কবির সস্নেহ শ্রদ্ধা বর্ষিত হয়েছে।

৭.১২.১ অনুশীলনী

১। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় কবির যে নতুন জীবন দর্শন প্রকাশ পেয়েছে তা দেখান।

২। 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে দেখান যে গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকগূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

৭.১৩ বাঁশিওয়ালা

'শ্যামলী' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'বাঁশিওয়ালা'। 'শ্যামলী' ও পুনশ্চের মতোই গদ্যছন্দে এবং একই ভাবধারায় রচিত কবিতার সমষ্টি। 'শ্যামলী' নামটির সঙ্গে মাটি-মায়ের একটা যোগসূত্র অনুভূত হয়। বাংলাদেশের মাটির প্রতি কবির মমতা গভীর এবং আত্মিক। সেই শ্যামল মাটি থেকেই 'শ্যামলী'র উদ্ভব। 'শ্যামলী'তে বিভিন্ন ভাবধারার কবিতা স্থান পেয়েছে তার মধ্য 'বাঁশিওয়ালা' কবিতাটি একটি প্রেমমূলক কবিতা এবং রোমান্টিক প্রেম কবিতার নিদর্শনবাহী। কবি এখানে পরিণত মনস্ক সেই পরিণত হাতে ছাপ এখানে স্পষ্ট অর্থাৎ প্রেমের চিরন্তন রহস্য নানা ভাব-কল্পনার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবিতাটিতে মর্তলোক থেকে অমর্তলোকে যাত্রার কথাই বলা হয়েছে।

দশটি স্তবকে বিন্যস্ত 'বাঁশিওয়ালা' কবিতার সাধারণ মেয়ে বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরে নিজের মধ্যে নতুনকে আবিষ্কার করতে চায়, শুনতে চায় তার নতুন নাম। তাই সে বাঁশিওয়ালাকে চিঠি লিখেছে।

সে লিখেছে—বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ে সে, সৃষ্টিকর্তা তাকে গড়তে পুরো সময় দেননি, তাই সে আধাআধি হয়ে আছে। তার অন্তরে বাইরে মিল হয়নি, 'মিল হয়নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে/মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়'। সে এক অর্থে অবহেলার সামগ্রী। এই মেয়েকে তিনি চলতি কালের মতো করে গড়ে তোলেননি, কাল স্রোতের অপর পার বালুডাঙায় ফেলে রেখেছেন। সেখান থেকে দূরের জগৎটা তার কাছে ঝাপসা লাগে, তার মন অধীর হয়ে ওঠে অধরাকে ধরবার আকাঙ্ক্ষায়। দু'হাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু কোনো কিছুরই নাগাল পায় না সে।

গতানুগতিক জীবনযাপন কালে মেয়েটির আর বেলা কাটে না, সে জীবন জোয়ারের গতির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। তার সামনে দিয়ে ভেসে যায় মুক্তি পারের খেয়া, ভেসে যায় ধনপতি সদাগরের ডিঙা, চলতি বেলার আলো-ছায়ার লীলা দেখতে দেখতে বেজে ওঠে বাঁশি, সেই বাঁশির সুরে ভরা আছে জীবনের স্বপ্ন, সেই স্বপ্নই তার মরা জীবন-নদীতে প্রাণের বেগ সৃষ্টি করে। অবসন্ন জীবনে প্রাণের স্পন্দন শুনতে পায় সে।

বাঁশিওয়ালার বাঁশিতে কি সুর বাজে সে জানে না, কিন্তু সে সুর তার মনে জাগায় ব্যথা। তাই সে ভাবে বুঝি এই পঞ্চমরাগে ফিরে আসে দক্ষিণ হাওয়ার নব যৌবনের ভাটিয়ালি। এই সুর শুনতে শুনতে নিজেকে তার মনে হয় পাহাড় তলির এক ঝিরঝিরে নদী, তার বুকে ঘনিয়ে উঠছে বাদল রাত্রি। সে নদী স্থাবর জীবনের বাধা অতিক্রম করে স্রোতের ঘূর্ণি-মাতনের মতো এগিয়ে চলে।

‘বাঁশিওয়ালার’ বাঁশির সুর এই মেয়েটির রক্তে নিয়ে আসে ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক, এমনকী পাঁজরের উপরে আছাড় খাওয়া মরণের ডাক পর্যন্ত, আনে উদাসী হাওয়ার যাক। তার ডাকে ঘরের বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়, অপূর্ণ ছোটে পূর্ণতার অভিমুখে। তার অঙ্গে অঙ্গে পাক খেয়ে যায় কালবৈশাখীর ঘূর্ণিঝড়।

এই শ্যামল মেয়েটি, যাকে ভগবান গড়েছেন অপূর্ব করে, যানা দেননি আকাশে ওড়বার মতো, বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুর তার প্রাণে স্বপ্ন জাগিয়েছে, তাই ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রামের পাগলামি জেগেছে তার মনে। সংসারে সে কাজ করে শান্ত হয়ে, সবার কাছে তাই সে ভালো। সবাই জানে তার ইচ্ছার কোনো জোর নেই, লোভ নেই, নিষেধের বাধাকে দুরন্ত বেলায় কাত করে ফেলে এমন ক্ষমতাও নেই তার, ভালোবাসতে জানে না কঠিন ভাবে, শুধু জানে কাঁদতে আর অপরের পায়ে মাথা কুটতে।

কিন্তু বাঁশিওয়ালার বাঁশি শুনে এই সাধারণ মেয়েই অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। আপন গরিমায় সে তার মাথা উঁচু করে চলে। এই নারীর ভিতরে এক বিদ্রোহিণী সত্তা জাগ্রত হয়, কুয়াশায় ঢাকা ছোঁড়া পর্দা সরিয়ে তার জীবনে নতুন সূর্যোদয় হয়। সে জীবনে তার যা কিছু বারণ না মানা আগ্রহ আগুনের ডানা মেলে দেয়। অর্থাৎ তার খাঁচায় বন্ধ এতদিনকার জীবনটা অজানা শূন্য পথে চলতে থাকে—‘প্রথম-ক্ষুধায়-অস্থির গরুড়ের মতো’। এই বিদ্রোহিণী নারীর কাছে ভীরুতা আজ ধিক্কৃত হয়, ধিক্কৃত হয় পুরুষের কাপুরুষতা।

বাঁশিওয়ালা এই মেয়েটিকে হয়তো দেখতে চেয়েছে, কিন্তু কোথায়, কখন, কীভাবে তার সঙ্গে দেখা হবে সে কথা তার জানা নেই, এমনকী তাকে সে চিনবে কেমন করে তাও সে জানে না। শুধু জানে তার ছায়া রূপটি গোপনে গেছে অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে অভিসারের পথে। সেই অজানাকে কত বসন্তেও সে পরিয়েছে ছন্দের মালা, যার ফুল শুকোবে না কোনোদিন।

ঘরোয়া নির্জীব একটা সামান্য মেয়েকে বাঁশিওয়ালার ডাক ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে বার করে আনল অবগুণ্ঠনহীন করে। তাকে মুক্তি দিল প্রেমের অমৃতলোকে যেমন করে নতুন ছন্দ গান হয়ে উঠেছিল বাল্মীকির কণ্ঠে, চমকে দিয়েছিল তাঁকে, ঠিক তেমনি ভাবে বাঁশিওয়ালাও সাধারণ এই ঘরকুনো মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠবে। সেই সাধারণ মেয়েটি নামবে না তার গানের আসন থেকে, সে তোমাকে লিখবে চিঠি, রাগিণীর আবছায়ায় বসে—কিন্তু বাঁশিওয়ালা জানবে না তার ঠিকানা। কবিতার একেবারে অন্তিমে এসে সে বাঁশিওয়ালাকে সম্বোধন করে প্রেমের গভীরতাকে সংগোপনে রাখার মানসে সে তাদের অসাক্ষাৎকে বাঁশির সুরের দূরত্বে দূরে রেখে দিতে চাইল। বাঁশির সুর দূর থেকে ভেসে আসে বলেই তার প্রতি মানুষের যা কিছু আকর্ষণ, প্রেমও অনেকটা তাই, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেম কখনোই মিলনে নয়, প্রতীক্ষাতেই সার্থক হতে চায়। ‘বাঁশিওয়ালা’ একটি অসাধারণ নিপাট প্রেমের কবিতা, তথা প্রেম-প্রতীক্ষার কবিতা। বাংলাদেশের সাধারণ নারী যখন সংসারের জালে বন্দি তখন বাঁশির সুর তাকে সেখান থেকে মুক্তির দিশা দিয়েছে। তাই মেয়েটি বাঁশিওয়ালার প্রেমে পাগল হয়েছে। এই প্রেমকেই সে সংগোপনে তার হৃদয়ে রেখে দিতে চায়, পাছে মিলনে তা শেষ না হয়ে যায়—তাই তার কণ্ঠে করুণ মিনতি—

‘ওগো বাঁশিওয়ালা
সে থাক্ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।’

৭.১৩.১ অনুশীলনী

১। ‘বাঁশিওয়ালা’ কবিতাটিতে গল্পরসের সঙ্গে কাব্যরস কীভাবে মিলেছে তা দেখান।

২। ‘বাঁশিওয়ালা’ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা পরিস্ফুট করুন।

৭.১৪ 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়'

রবীন্দ্র কাব্যধারায় 'প্রান্তিক'-এর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের দুর্লভ সৌভাগ্য কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে এই কাব্য রচনায়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—এই অকস্মাৎ হতচৈতন্য লোক হইতে প্রত্যাবর্তনকে কবি নবজীবন লাভের সহিত তুলনা করিয়াছেন, মন হইতেছে অধ্যাত্মলোকের নবতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। মৃত্যুযবনিকার তোরণ হইতে অজানার যেটুকু আভাস পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাহাই ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা করিলেন নূতন কবিতায়, যেগুলি পরে 'প্রান্তিক'-এর অন্তর্গত হইয়াছে।' [রবীন্দ্র জীবনী ৪র্থ খণ্ড]। বস্তুত ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কবি সাময়িকভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং সৌভাগ্যবশত তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। ফলে সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে এখানে। 'প্রান্তিক'-এ মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যক্ষ ধারণার গভীর প্রকাশ আছে। 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়' কবিতাটি 'প্রান্তিকের' ৯ নম্বর কবিতা।

'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়' কবিতাটি ঔপনিষদিক আত্মোপলব্ধির গভীর থেকে লেখা। জীবন রঙ্গমঞ্চে কবি এতদিন যে পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন, মৃত্যুদূতের স্পর্শে আজ তা তাঁর কাছে নিরর্থক বলে মনে হচ্ছে। বাইরের যা কিছু প্রসাধন সব ভেসে গেছে, আপনার পূর্ণতা উপলব্ধির জন্য কবিআত্মা উন্মুখ। আসন্ন জীবন-চেতনার গোধূলি বেলায় কবি দেখলেন, কাল সমুদ্রের স্রোতে তাঁর দেহখানি ভেসে যাচ্ছে, বিচিত্র বেদনা নিয়ে তাঁর অনুভূতিগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে, বিচিত্র চিত্র রঞ্জিত যে আচ্ছাদনের অন্তরালে এতদিন তিনি আপন পরিচয় ভুলে ছিলেন, সেই আজন্মের স্মৃতিও আজ ক্ষীণ হয়ে আসছে, এমনকী জন্মগ্রহণের পর যে বাঁশিটি জননী তাঁকে দিয়েছিলেন, আজ সেই বাঁশিটিকেও মিলিয়ে যেতে দেখলেন কবি। তিনি ক্রমে নিজেকেই দূরে ম্লান হয়ে যেতে দেখলেন, দেখলেন পরিচিত জগৎটাকেও মিলিয়ে যেতে। সন্ধ্যা আরতির ধ্বনি আর শোনা যায় না, ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, দীপশিখা ঢাকা পড়ে যায়, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে। পারাপার বন্ধ হয়ে যায়—সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি কবির চেতনা লোক থেকে ক্রমে দূরে সরে যায়—চারিদিকে মহাস্তব্ধতা, মহাশূন্যতা বিরাজ করে। নিজের দেহটি ছায়া হয়ে, অন্তহীন অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। কবি নিঃসঙ্গ একাকী হয়ে প্রার্থনা জানান—'হে পূষন্, তোমার রশ্মিজাল সংবরণ করেছ, এবার তোমার কল্যাণতম রূপটি প্রকাশ করো, এবার যেন দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক'।

এই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখবার ইচ্ছা শেষ জীবনে কবির বাসনায় পরিণত হয়েছে। প্রান্তিক থেকেই কবির দার্শনিক সত্তার প্রকাশ লক্ষ করা গেল।

'প্রান্তিক' কাব্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর মিতায়তন। মাত্র আঠারোটি ছোট ছোট কবিতার সংকলন এই কাব্য গ্রন্থটি। তবে কবিতাগুলির মধ্যে একটা নিবিড় যোগ লক্ষ কার যায়। সবগুলিকে এক সঙ্গে পড়লে মনে হবে যেন একটি অখণ্ড কবিতা। কবি যেন নিদারুণ সেই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে মুক্তির আনন্দ লাভ করেছেন। প্রান্তিকের কবিতার ভাবনা মৃত্যু, তার সুর মৃত্যু—এই মৃত্যুভাবনা পূর্বের মৃত্যুভাবনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রমথ বিশীর ভাষায়—"ইহাদের সর্বাঙ্গে জীবন ও মৃত্যু 'ডেডলেটার আপিস' এর শীল মোহর মুদ্রিত।" [রবীন্দ্র সরণী]

৭.১৪.১ অনুশীলনী

১। 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়' কবিতাটি কোন সময়ে লেখা হয়েছে ? কোন্ কাব্যের কবিতা এটি। কবিতাটি বিশ্লেষণ করে কবির সেই সময়ের মনোভাবের পরিচয় দিন।

২। 'প্রান্তকে'র কাব্যের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য কবিতাটির মূলভাব ব্যক্ত করুন।

৩। 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়' কবিতাটিতে কবির মৃত্যু চেতনার যে পরিচয় আছে তা প্রকাশ করুন।

৭.১৫ তোমার সৃষ্টির পথ রেখে আকীর্ণ করি

'শেষলেখা' কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতা এটি। 'শেষলেখা' কাব্যের প্রকাশ ১৩৪৮ সালে ভাদ্র মাসে। কবির তিরোভাব ঘটে ১৩৪৮-এর ২২শে শ্রাবণ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের নামকরণ করে যেতে পারেননি। এমনকি এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতা আছে যেগুলি কবি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচনা করেছেন। তথাপি এ কাব্যের কবিতা অনেক বেশি সংহত, অনেক বেশি দার্শনিক মনন ঋদ্ধ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এ কাব্যে শুধু মৃত্যু চিন্তা নয়, জীবনও যে তাঁর কাছে কত সত্য, সৃষ্টি যে কত সত্যতর সে বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র সমালোচক শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁর 'রবীন্দ্র-কাব্যের গোধূলী পর্যায় (২) ' গ্রন্থে যে কথা লিখেছেন তা স্মর্তব্য—"এখানে অসীম লোকে যাত্রার ব্যাকুলতা যেমন আছে, তেমনি গতিশীল বিশ্বে আত্মার অবিনশ্বরতার স্বীকৃতি, মানব মহিমার জয়গানও আছে। আবার স্মৃতিমূলক সংবেদনও ধরা পড়েছে, সাময়িক ব্যাপারের প্রতিও মনোযোগ রয়েছে, দুঃখের কঠিন সাধনায় আত্মস্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস যেমন আছে, তেমনি প্রকৃতির স্বরূপকে বোঝার চেষ্টাও বাণীরূপ লাভ করেছে"।

'শেষলেখা' কাব্যের এই কবিতাটি রবীন্দ্র-কবিজীবনের সর্বশেষ রচনা। মৃত্যুর মাত্র ৮ দিন আগে ৩০শে জুলাই ১৯৪১-এ কবিতাটি রচনা শুরু করেন এবং শেষ হয় মৃত্যুর দেড়ঘন্টা পূর্বে। ঔপনিষদিক কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরম উপলব্ধি, তাঁর ব্যক্তিজীবনের ও কবিজীবনের সর্বশেষ কথাটির তথা পরম জিজ্ঞাসার উত্তর আছে এ কবিতায়। এই কারণেই কবিতাটির মূল্য অপরিসীম।

কবি এতকাল প্রকৃতির ছলনাময়ী রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, প্রকৃতির মায়াময় রূপের কাছেই ধরা দিয়েছিলেন। আর তাই অজস্র সৃষ্টিতে নিজেকে সার্থক করে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির সেই 'মায়া' কে তখন তাঁর কাছে মায়া বলে মনে হয়নি। কিন্তু আজ জীবনের এই উপান্ত পটে এসে কবি প্রকৃতির ছলনাময়ী রূপের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তথা তার মায়া সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। কারণ, তিনি বুঝেছেন মায়ার এই কুহক যে ধরতে পারে, সে অনায়াসে তার ছলনাজাল অতিক্রম করতে পারে। তাইতো কবি লিখলেন—'সত্যেরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।'

প্রকৃতির এই যে মায়ার জাল তা অতিক্রম করতে সেই আমাদের পথ দেখায়—

'তোমার জ্যোতিষ্ক তারে যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চিরস্থায়ী সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল'।

এই পথ বাইরে কুটিল হলেও ভিতরে কিন্তু সে ঋজু—তার গৌরবই এইখানে। লোকসমাজে সে নিজে বিড়ম্বিত বলে প্রতিভাত হলেও এই সত্যদ্রষ্টা আপন অন্তরে যাকে পায় সেই তার প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া পরম পুরস্কার। এই শেষ পুরস্কারকে সে তার আপন ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে। প্রকৃতির এই ছলনাকে যিনি ধরতে পারেন তিনিই লাভ করেন 'শান্তির অক্ষয় অধিকার'।

বিজ্ঞানীরাও অনুরূপ কথা বলেছেন, কিন্তু অন্যভাবে বলেছেন। তাঁরা মনে করেন, জড় ও শক্তি নিয়ে যে বহির্জগৎ, যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তা হচ্ছে বিশ্বের স্থূল স্বরূপ। এই কারণেই বিশ্বকে বলা হয় মায়াময়। জল ও শক্তি তার বহিরাবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে এই বিশ্বের মূল স্বরূপকে। আর সূক্ষ্ম ও বিশাল জগৎ রয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমা ছাড়িয়ে। বিজ্ঞানীরা এই জগৎকে জানেন যন্ত্রের সাহায্যে, কবি জানতে পারেন তাঁর কল্পনার আশ্রয়ে।

ব্রহ্মকে লাভ করলেও মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। সর্বত্র তার ছলনা জাল পাতা আছে। তাই অন্তরের আলোয় ব্রহ্মকে দর্শন করতে পারলে তবেই পরম শান্তি লাভ সম্ভব। ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে মায়ার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হয় এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত হতে হয়। অন্তিমকালে কবি ব্রহ্মাতিরিক্ত সব কিছুকেই মায়িক বলে মনে করেছেন। এমনকী প্রকৃতির সৌন্দর্যও, যা এতদিন কবি নিবিষ্ট চিত্তে উপভোগ করেছেন তাও তার কাছে মায়ার ছলনা বলেই অনুভূত হয়েছে। এই মায়ার ছলনার হাত থেকে কবি মুক্তি লাভ করে শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করতে চলেছেন—কবিতার শেষ তিনটি পঙ্ক্তিতে শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভের উপায়ের কথা বলেই কবি ক্ষান্ত হয়েছেন। এই পরম উপলব্ধির বাণীই শেষ কবিতার মূল প্রতিবাদ্য বিষয়। ব্রহ্মের মায়া থেকে মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়ে কবি তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন এই কবিতায়। এই কারণে কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

৭.১৫.১ অনুশীলনী

১। ‘শেষলেখা’ কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতাটিতে কবির যে দার্শনিক ভাবনার পরিচয় আছে তা লিপিবদ্ধ করুন।

২। ‘শেষলেখা’ কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতাটি কবির সর্বশেষ রচনা—মৃত্যুর পূর্বে লেখা ও কবিতায় কবি কীভাবে ‘শান্তির অক্ষয় অধিকার’ লাভ করেছেন আলোচনা করুন।

৩। ‘শেষলেখা’ কাব্যের ‘তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি’ কবিতাটি রবীন্দ্র-কবিজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে—আলোচনা করুন।

৭.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্র জীবনী (৪র্থ খণ্ড)— প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

২। ‘রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা’—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। ‘রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা’—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৪। ‘রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ’—প্রমথনাথ বিশী/রবীন্দ্র সরণী—প্রমথনাথ বিশী

৫। ‘রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়’—শুদ্ধসত্ত্ব বসু

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড (আনন্দ)—সুকুমার সেন

৭। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়